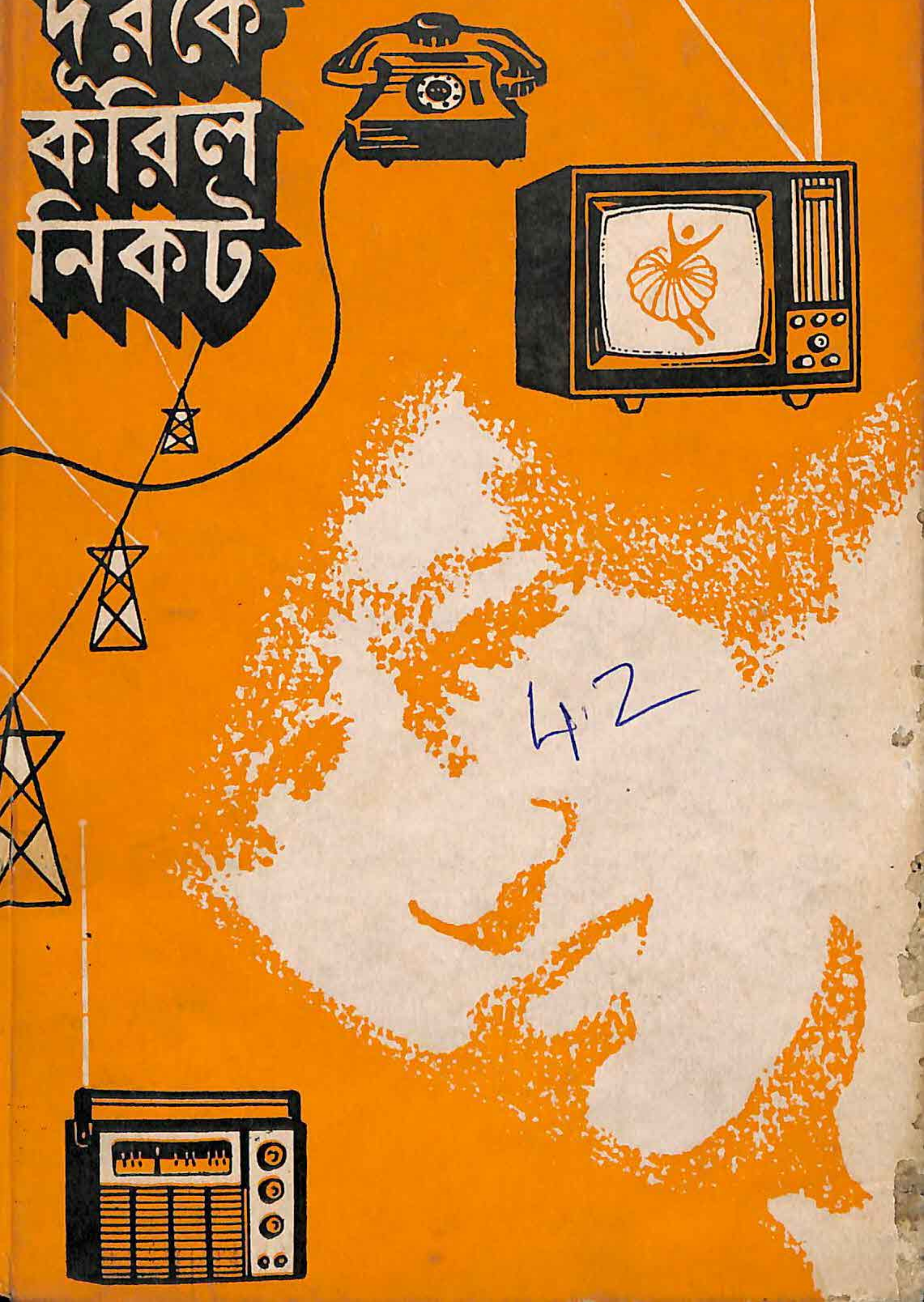
জন জে ফ্লোহার্টি

দূরকে করিল নিকট



দূরকে করিল নিকট

জন. জে. ফ্লোহার্টি

রবীন্দ্রনাথ সরকার অনূদিত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ :
শারদীয়া ১৩৬৪

সংশোধিত
দ্বিতীয় প্রকাশ :
ভাদ্র ১৩৬৮

তৃতীয় মুদ্রণ :
আশ্বিন ১৪, ১৩৮৪
অক্টোবর ১, ১৯৭৭

প্রকাশক :
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২।১ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বাঁধাই :
সুবর্ণ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

দাম: ॥১৫.০০॥
~~আট টাকা~~

সূচীপত্র

১

টমটম থেকে টেলিগ্রাফ

১৯৫৩ সনের ২রা জুনের সকাল। তারিখটি এক মহা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের দিনরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিন ওয়েস্টমিন্স্টার গির্জায় একটি সুশিক্ষিতা ইংরেজ মেয়ের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হল ; ইনি গ্রেট ব্রিটেনের পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম শাসিকা এবং অষ্টম সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

উৎসব কেন্দ্র থেকে তিনহাজার ছশ মাইল দূরে পরিবারবর্গের সঙ্গে প্রাতরাশ খেতে বসেছি আমি। মানহ্যাসেট বে ও লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ড থেকে একশ ফুট উঁচুতে ম্যাপ্‌লের ছায়া ঢাকা ছাতে আমাদের টেবিল পাতা হয়েছে। দূরের কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক শহরের সব গম্বুজ ও মিনার অস্পষ্ট কালো ছবির মত গ্রীষ্মের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার পাশে টেবিলে বসানো রয়েছে একটি চক্‌চকে কালো বাক্‌স, এত ছোট যে অনায়াসে কোটের পকেটে পুরে আনা যায়। ওটা একটা সহজে বহনযোগ্য রেডিও গ্রাহকযন্ত্র। যেই তার ঢাকনাটা তুলে দিলাম, শোনা গেল একটি পুরুষের ভরাট কম্পিত কণ্ঠস্বর। তার উচ্চারণভঙ্গী ব্রিটিশ ; ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে প্রচারক সুন্দরী তরুণী সম্রাজ্ঞীর অভিষেকের বিস্তৃত বর্ণনা করে চলেছে।

মাঝে মাঝে সে থামিয়ে দিচ্ছিল তার কাহিনী-ধারা ; শোনা যাচ্ছিল, ক্যাণ্টারবারির প্রধান যাজক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে নতুন শাসিকাকে প্রতিজ্ঞা ও শপথ পাঠ করাচ্ছেন আর রানী মৃদুকণ্ঠে বলছেন, 'আমি শপথ করছি, এ সবই আমি করবো।' উপস্থিত রাজপুরুষগণ আনন্দোচ্ছল সুরে ঐকতান সঙ্গীত গেয়ে উঠলেন আর

তা বিরাট গির্জার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রানী যখন রাজকীয় শকটে অগ্রসর হতে লাগলেন তখন লণ্ডন এবং আমাদের কালো বাক্সটির মধ্যেকার ৩,৬০০ মাইল ব্যবধান পার হয়ে সুস্পষ্টরূপে ভেসে আসতে লাগল অযুতকণ্ঠের উল্লাসধ্বনি আর ঘোড়ার খুর ও মিলিটারী বুটের খট খট শব্দ।

ব্রিটিশ ধারা-প্রচারকের সমাপ্তি-জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাক্সের ডালাটি বন্ধ করে দিলাম। চারিদিকে ঘনিয়ে এল নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে সে স্তব্ধতা ব্যাহত হতে লাগল কেবল আমাদের অঞ্চলচারী পাখিদের কলকণ্ঠের গানে।

আমি আধুনিক বিজ্ঞানের এই অলৌকিক কীর্তিতে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। তারপর সহসা মনে পড়ল স্যামুয়েল বি. মর্সের ঐতিহাসিক উক্তি 'ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন'—টেলিগ্রাফে প্রেরিত প্রথম কথা, দূর-দূরান্তস্থিত মানুষের প্রথম তাৎক্ষণিক যোগাযোগ।

মর্স যখন বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর প্রতিভা নিয়োগ করেন, তখন শিল্পী হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮১০ সনে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করে শিল্পচর্চার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান। ওখানে তিনি তড়িচ্চুম্বক বিষয়ে একটি বক্তৃতা শোনেন, আর তারপরেই তড়িৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে তীব্র আগ্রহের সঞ্চার হয়। কয়েক বছর পরে ডাকবাহী জাহাজ সালীতে (Sully) যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের সময়ে টেলিগ্রাফের তত্ত্ব তাঁর মনে জাগ্রত হয়। নিউইয়র্কে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি, যা দিয়ে দূরদূরান্তে বার্তা প্রেরণ সম্ভব। ঐ একই সময়ে তিনি বিন্দু ও রেখা দিয়ে বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের প্রতীক একটি সাঙ্কেতিক ভাষারও উদ্ভাবন করেন। আজও ঐ ভাষাকে বলা হয় মর্স সাঙ্কেতিক (Morse Code)।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর তড়িচ্চুম্বকীয় টেলিগ্রাফের পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। সেদিন উপস্থিত দর্শকগণের

মধ্যে এ বিষয়ে অতি সামান্য কৌতূহলেরই সঞ্চার হয়েছিল। একটুও হতাশ না হয়ে তিনি তাঁর পরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৮৩৮ সনে তিনি বাল্টিমোর থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক টেলিগ্রাফ লাইন খোলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কংগ্রেসের কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন। সে অনুরোধের জবাবে তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল সংশয় ও বিদ্রূপ। তীব্র হতাশায় তিনি ফিরে গেলেন ইউরোপে ; আশা ছিল কোন বিদেশী সরকার হয়তো তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারে। সব জায়গা থেকেই তিনি পেলেন প্রত্যাখ্যান।

পর্যুদস্ত, কপর্দকহীন অবস্থায়ও চলল তাঁর সংগ্রাম। কয়েক বছর ধরে মূলধন নিয়োগকারীদের তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাঁর আবিষ্কার থেকে অপর্যাপ্ত অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ তাঁর যুক্তিতে কর্ণপাত করল না। চূড়ান্ত অসাফল্যের সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন তিনি তখন। সেদিন রাত্রে শুয়ে আছেন তাঁর অপরিচ্ছন্ন ভাড়াটে ঘরে। ঘুম এল না চোখে ; ক্লান্ত পীড়িত-হৃদয়ে পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠলেন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে একটি ডাকবাহী জাহাজ। ওয়াশিংটনের ছাপমারা একখানা চিঠি পেলেন তিনি। সে চিঠি খুলতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল তাঁর। অনবরত নিরাশ হয়ে হয়ে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, তাই সে চিঠির বক্তব্য যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কংগ্রেস চলতি অধিবেশনের শেষ দিন মধ্যরাত্রিতে তাঁর বাল্টিমোর থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক টেলিগ্রাফ লাইনের জন্য ৩০,০০০ ডলার মঞ্জুর করেছে।

দুই নগরীর মধ্যে তার বসানোর কাজ এক বছরেরও কম সময়ে সমাপ্ত হল। বিজয়োৎফুল্ল আবিষ্কারক তাঁর তড়িচ্চুম্বকীয় টেলিগ্রাফের অবিমিশ্র সাফল্য সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রদর্শন করলেন। ওয়াশিংটনে ক্যাপিটলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট গৃহ থেকে

ষাট মাইল বিস্তৃত তার-পথে বাল্টিমোরে প্রথম বার্তা প্রেরিত হল ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে। সেদিন থেকে শুরু করে টেলিগ্রাফের তার সমগ্র জগতে সেতুবন্ধন রচনা করেছে, যুক্ত করেছে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে। তাৎক্ষণিক সংবাদ পরিবেশনের ফলে জগতের মানুষ আজ পরস্পরের নিকট প্রতিবেশী। মর্স যে চিঠি পেয়েছিলেন সেটা পেঁছিতে লেগেছিল পঁচিশ দিন। সেই সংবাদ কয়েক বছর পরেই পঁচিশ সেকেণ্ডে প্রেরণ করা সম্ভব হল।

মর্সের আবিষ্কার যে বিস্ময়কর ছিল তাতে সংশয় নেই, কিন্তু বহুদূরের সংবাদ আদান-প্রদানে এটি প্রথম ধাপমাত্র। মানুষের কণ্ঠস্বর আছে, বাগ্‌যন্ত্র আছে—এটা আবিষ্কারের পর থেকেই কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে এসেছে সে। প্রথমে সে জড়বস্তু ও প্রাণীদের ধ্বনি নকল করে একাক্ষর শব্দ দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করতো। ধীরে ধীরে বহু শতাব্দী কেটে গেল। তখন সেইসব শব্দ গুছিয়ে বাক্যে পরিণত করা হল, জন্ম হল ভাষার। মানুষ তার চিন্তা, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা সবই প্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর যত শক্তিশালীই হোক, সাধারণ অবস্থায় কয়েক শ গজের বেশী দূরে শ্রুত হ'ত না, এই ছিল তার দুঃখ।

তারপর হয়তো একদিন আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল, দু'হাতের অঞ্জলি দিয়ে মুখ বেড় দিয়ে খোলা দিক চোঙার মত তুলে চীৎকার করলে সে শব্দ আরও বেশী দূরে যায়। ঐ হল প্রথম মেগাফোন। আবার তা থেকে সৃষ্টি হল নানা রকমের শিঙা—প্রাণীর শিঙ, পেঁচানো সামুদ্রিক শামুক, শঙ্খ বা লম্বা নল দিয়ে তৈরী।

যুগ যুগান্ত কেটে চলল, ঐ সব আদিম শিঙা ধাতব শিঙায় রূপান্তরিত হল। বহুলোকের জমায়েতে শিঙাই হল সংবাদ আদান প্রদানের যন্ত্র। প্রাচীনকালের যুদ্ধের হট্টগোলের মধ্যে শিঙাধ্বনি ক'রে হুকুমজারী করা হ'ত। শিঙার তীব্র ধ্বনি অধিনায়কদের কণ্ঠকে

বহুদূরে বহন করে নিয়ে যেত। যুযুধান সৈন্যগণ কণ্ঠস্বরেরই মত সুস্পষ্ট শিঙাধ্বনি মেনে চলত ;—যেন, এগিয়ে যাও! আক্রমণ কর! গুলি থামাও! পিছু হটো!—বা এমনি আরও বহু আদেশ শুনছে তারা।

বর্তমান যুগে যে বহু ধরনের শব্দ-সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওগুলি ছিল তার প্রথম বিকাশ। স্টীম ও মোটরচালিত জাহাজে এক ধরনের ধ্বনি-সঙ্কেত ব্যবহার করা হয় ; তা দিয়ে তারা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনও করে। একটি জাহাজ যখন আরেকটি জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে তখন প্রথমটি থেকে দু'বার বাঁশি বাজালে বোঝা যাবে 'আমি ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি' একবার মাত্র শব্দ হলে তার অর্থ হবে জাহাজটি বাঁ দিক দিয়েই চলে যাচ্ছে। সমুদ্রগামী বাষ্পীয় টানা-জাহাজে লম্বা ছোট নানা ধরনের বত্রিশ রকম হুইস্‌ল্‌-ধ্বনি নিয়ে গঠিত এক নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক-প্রণালী ব্যবহার করা হয়।

দিনে অথবা রাতে কুয়াশার জন্য যখন বাতিঘর বা তার আলোক-রেখা দেখা যায় না, তখন তার বিরাট ফগহর্ণ থেকে পৃথক পৃথক রকমের ধ্বনি তুলে নাবিকদের সাবধান করে দেওয়া হয়। হর্ণের দু'টি ধ্বনির মাঝখানের নীরবতার সেকেণ্ড-সংখ্যা ও একটিমাত্র ধ্বনির সমপরিমাণ দ্বারা আচ্ছন্ন আলোকের পরিচয় জানা যায়।

এই নিবন্ধ লিখতে লিখতে আমি প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী এক্‌জিকিউশন রক বাতিঘরের ফগহর্ণের শোকাবহ আর্তধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। হর্ণের ধ্বনিকাল তিন সেকেণ্ড আর তার পরবর্তী নীরবতা-কালের স্থায়িত্ব সতের সেকেণ্ড। আটলান্টিক উপকূলের বাতিঘরের সঙ্কেত তালিকা দেখে নাবিক এই সব সময়-পরিমাণ থেকে এই নির্দিষ্ট বাতিঘরের পরিচয় জানতে পারে।

এক্‌জিকিউশন রক থেকে প্রত্যেক তিন মিনিটে একবার রেডিও সঙ্কেতের সঙ্গে একই সময়ে, লম্বা ও খাটো ধ্বনির এক একটি 'দূরত্ব

সঙ্কেত' প্রেরিত হয়। রেডিও-বার্তা আলোকের বেগে ভ্রমণ করে (সেকেণ্ডে ১,৮০,০০০), ছ'মাইল দূরবর্তী কোন জাহাজে রেডিও সিগন্যাল প্রায় তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায়। আর ধ্বনি সঙ্কেতের একই জাহাজে পৌঁছতে প্রায় ১০ সেকেণ্ড সময় লাগে, যেহেতু শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ১০০০ ফুট বেগে চলে। রেডিও এবং ধ্বনি-সঙ্কেতের প্রাপ্তিকালের পার্থক্যকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে আলোক থেকে আনুমানিক দূরত্বটা পাওয়া যায়; এক্ষেত্রে সেটা প্রায় ছ'মাইল।

অনগ্রসর মানবসমাজে বিভিন্ন আকারের ঢাক একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। টমটমই সম্ভবত সবচেয়ে সুপরিচিত আদিম সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র। এক সময় হাইতি দ্বীপে যখন ছিলাম আমি, মধ্যরাত্রিতে বহুদূরের পাহাড়ে স্থানীয় অধিবাসীদের এক উৎসবে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বৎসরের প্রথম পূর্ণিমারাত্রি ছিল সেটা। যে গাধায় চড়ে চলেছিলাম আমরা, সেগুলো কালো কালো পায়ে-চলা পথে নির্ভুল পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় বহু মাইল জুড়ে টমটম বাজতে শুরু করল। কতকগুলি কাছেই ঘন গাছপালার ঝোপের মধ্যে বাজছিল, আর কতকগুলি বাজছিল দূরে দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে। সবগুলি সমতালে বেজে চলেছিল, তাল ক্রমশ দ্রুত হচ্ছিল এবং অবশেষে সেই বাজনা যেন উন্মত্ত আবেগে উচ্ছল হয়ে উঠল। তারপর একসময় হঠাৎ যেন কোন সঙ্কেতের বলে সব শব্দ থেমে গেল, শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসতে লাগল ঢাকের কুর কুর শব্দ।

সেই স্পন্দনময়-শব্দঝড়ের সময়ে আমার মনে হল যেন গাধার পিঠে বসা অবস্থাতেই আমার দেহ টমটমের বাজনার তালে তালে দুলছে। ওই রহস্যময় ছন্দের দোলায় ভেসে চলেছি দেখে আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সে যেন ওয়াল্‌জ্‌ নাচের সময়ে দ্রুততালে অর্কেস্ট্রার দোলা অগ্রাহ্য করে অন্যভাবে নাচতে চেষ্টা করার মত অর্থহীন হল।

পরদিন সকালে, আমি যাঁর অতিথি হয়েছিলাম সেই মেজর 'এক্সের' সঙ্গে প্রাতরাশ খেতে খেতে সব শুনলাম; যদিও আদিম উত্তেজনায় ইন্ধন যোগায় বলে হাইতির সরকার টমটমকে সুনজরে দেখে না, তবু টেলিফোন যেমন আমাদের দেশে লোকের জীবনের অংশ, তেমনি টমটমও হাইতির জনসাধারণের জীবনের অভিন্ন অঙ্গ। তাছাড়া যখন সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় অধিবাসীদের ডাকবার প্রয়োজন হয় তখন এটাই হল সংবাদ জ্ঞাপনের কালাগত প্রথা।

মেজরকে প্রশ্ন করেছিলাম মানুষের আবেগের উপর টমটমের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন কিনা।

তিনি উত্তর দিলেন, 'শোনা যায়, নিপুণ ঢাকী হৃদ্স্পন্দনের সঙ্গে তাল রেখে টমটম বাজায়। বাজাতে বাজাতে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে, তার হৃদয়ের স্পন্দন ক্রমশ দ্রুততর হয়, তার ফলে তার ঢাকও ক্রমবর্ধমান দ্রুত লয়ে বাজতে থাকে। তার খুশীর উচ্ছলতা শীঘ্রই শুধু অন্য ঢাকীদের মধ্যে নয়, তার শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। এক সময়ে আদিম বন্য নাচ-গানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের লোক ক্ষেপে উঠেছিল এবং তখনও এমনি ব্যাপার ঘটেছিল। যে সঙ্গীতকারগণ নৃত্যের অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন, তাঁরা অনেক সময় এমন এক বন্য সঙ্গীত-প্রেরণায় উন্মত্ত হয়ে উঠতেন যে সেই উন্মত্ততা নৃত্যশীল শ্রোতৃবর্গের মধ্যেও সঞ্চারিত হ'ত। একসারি ঢাক ছাড়া কোন অর্কেস্ট্রা সম্পূর্ণ হ'ত না এবং ঐ ঢাকের বাজনার মধ্যে আদিম টমটমের অসংবৃত আবেগ ফুটে উঠতো।

ঘণ্টা, পেটাঘড়ি, করতাল, ফাঁপা কাঠের গুঁড়ি এবং ধোঁয়া পর্যন্ত সু বা কুসংবাদ প্রেরণের জন্য সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। আয়নাতে দীর্ঘ বা অল্প সময়ে সূর্যালোক প্রতিফলিত করে বহু বৎসর ধরে সামরিক সংবাদ আদান-প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। প্রেরকযন্ত্রকে বলা হ'ত হেলিওগ্রাফ।

মহাদেশ জরীপের সময় উপকূল ও ভূমি জরীপ ক্ষেত্রের কর্মিগণ বহু পর্বতশ্রেণীর সম্মুখীন হয়; এইসব পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে কাল্পনিক কিন্তু সঠিক লাইন টানতে হয়। এক পর্বতশৃঙ্গ থেকে হয়তো পঞ্চাশ মাইল বা আরও বেশী দূরবর্তী আরেক পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত সরাসরি দেখতে হয়। দিনের বেলায় বহুক্ষেত্রেই ঐসব বহুদূরস্থিত বিন্দুগুলি মেঘ কুয়াশা বা দাবাগ্নির ধোঁয়ায় পরস্পরের নিকট অদৃশ্য হয়ে থাকে। মধ্যবর্তী উপত্যকা থেকে যে উত্তাপ উত্থিত হয় তার ফলে আলোকের প্রতিসরণ ঘটে, ফলে নির্ভুল গণনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে আমিনেরা মধ্যরাত্রির পরে তাদের কাজ শুরু করে। তখন জরীপ যন্ত্রে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে এক পর্বতশৃঙ্গের সূক্ষ্ম আলোকবিন্দুও আরেক পর্বতশৃঙ্গ থেকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। তখন আলোকবিন্দুর সাঙ্কেতিকের সাহায্যে নির্ভুল সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হয়। এ কাজে যে আলোকরশ্মি ব্যবহৃত হয়, তা ব্যাটারীভরা সাধারণ টর্চের আলো।

নিউইয়র্ক বন্দরের প্রবেশমুখে এমব্রোজ আলোকপোতের উপর যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত বাতিটি এই সব আলোকের সঙ্গে তুলনীয়। ত্রিশ মাইল দূরের নিউইয়র্ক শহর থেকে এর ৫,৬০০,০০০ ক্যাণ্ড্‌ল্‌-শক্তির আলোক সুস্পষ্ট দেখা যায়। যে কোন দিকের বিচারে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নৌচালন আলোক। পৃথিবীর বৃহত্তম ও ব্যস্ততম বন্দরে প্রবেশকামী হাজার হাজার জাহাজকে এই বাতি থেকে নির্ভুল সঙ্কেত প্রদান করা হচ্ছে। সমুদ্র যখন অন্ধকার বা কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকে, এর আলোকদীপ্তি তখন নাবিকের প্রাণে আশার সঞ্চার করে, তাকে এমব্রোজ প্রণালী ও নিরাপদ পোতাশ্রয়ের পথনির্দেশ প্রদান করে। এর ভূমিকা যেন যানবাহনাকীর্ণ চৌমাথায় ট্র্যাফিক পুলিসের ; যে সব জাহাজ ভিতরে প্রবেশ করছে, বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বা আড়াআড়ি চলছে এই বাতি তাদের সঠিক পথে চালিত করছে। এই বাতিটি

না থাকলে নিউইয়র্ক বন্দরে প্রবেশ করা হ'ত বিপদসঙ্কুল, এমন কি মারাত্মক।

আরণ্য ও অপরিচিত 'দূর পশ্চিমে' উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে ক্যালিফোর্ণিয়া ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মহাদেশীয় রেলপথ তখনও সমাপ্ত হয়নি। টেলিগ্রাফ তখনও এক পরম বিস্ময়—সীমাবদ্ধ ছিল কেবল পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে। দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বহির্বিশ্বের সঙ্গে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

ওয়েলস্, ফারগো এবং এডামস্ এক্সপ্রেস কোম্পানি যাত্রীগাড়ী চালাতো। যাত্রী ও স্বর্ণ বহন করাই ছিল তাদের মুখ্য কাজ; তবু তারা ডাক আনা-নেওয়া করতো। অসমতল পথ, বিরুদ্ধ রেড ইণ্ডিয়ান এবং সশস্ত্র দস্যুদের রাহাজানির দরুন সেই পথে চলাচল অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। ভারী মালপত্র—খাদ্য, বস্ত্র, গৃহনির্মাণোপকরণ, চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বেশির ভাগ গরুর গাড়ীতে বহন করা হ'ত।

এই মালটানা ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ছিল মেজর ও ওয়াড্ডেল (Major & Waddell)। পশ্চিম সামরিক শিবিরে এক কোটি যাট লক্ষ পাউণ্ড মাল সরবরাহের জন্য তারা ৬০০০ মানুষ, ৪০,০০০ বলদ, ১০০০ খচ্চর এবং ৪০০০ গাড়ী খাটাতো। তারপর দ্রুত মাল প্রেরণের জরুরী প্রয়োজন অনুধাবন করে তারা গোপনে ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করলো। সমস্ত দেশ খুঁজে তারা সহিষ্ণু আরোহী ও দ্রুতগামী ঘোড়া বের করলো। দশ থেকে পনর মাইল দূরে দূরে তারা রিলে স্টেশনের ব্যবস্থা করেছিল। রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এর প্রত্যেক স্টেশনেই ছিল এক একটি দুর্গ। এই সব স্টেশনে অশ্ব ও আরোহীদের খাদ্য ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হ'ত; আর নতুন আরোহী ও ঘোড়া তাদের মূল্যবান ডাক বহন করে পরবর্তী রিলে স্টেশন পর্যন্ত চলে যেত।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের প্রথম অভিভাষণ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত প্রেসিডেন্টের সাবধানবাণী ওয়াশিংটন থেকে ক্যালিফোর্ণিয়ায় বহন করে নিয়ে যেতে কয়েক সপ্তাহ সময় কেটে যেত। ঐ সময়ে বিশেষ ট্রেনে করে মিসৌরিতে সেন্ট জোসেফ স্টেশন পর্যন্ত বার্তা প্রেরিত হল ; এটাই ছিল শেষ স্টেশন। পঁচাত্তর জন অশ্বারোহী বিভিন্ন রিলে স্টেশনে তৈরি হয়েছিল। দ্রুতগামী অশ্বক্ষুর ধ্বনিত শিকলের এক একটি শৃঙ্খল ছিল এই সব স্টেশন। সাতদিন সতের ঘণ্টায় সেই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে ২,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে প্রেসি-ডেন্টের বার্তা বহন করে নিয়ে যাওয়া হল।

এই সব অশ্বারোহীদের অনেকেই ছিল রেড ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা—বিপদ-সঙ্কুল বার্তা বহনে নিপুণ। এদের মধ্যে একজন, তার ডাকনাম ছিল মহিষ বিল (Buffalo Bill)। এদের কয়েকজন কষ্ট বা বিপদ সত্ত্বেও নানা দূরবর্তী স্থানে সংবাদ বহন করে নিয়ে যাওয়ায় ছিল বিশেষ অভিজ্ঞ। এরূপ প্রত্যেকটি কাজের জন্য তাদের বেতন ছিল ২,৫০০ ডলার পর্যন্ত। ঘোড়ার ডাকের জন্য প্রতি আধ আউন্সের সাধারণ ডাক-মাশুল ছিল ৫ ডলার। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তা কমিয়ে প্রতি আধ-আউন্স্ ১ ডলার করা হয়েছিল।

দু'হাজার বছর আগে চীনাদের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘ-দূর সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা ছিল। এক সামন্তের নিকট থেকে আরেক জনের কাছে লিখিত বার্তা বহনের জন্য ব্যবহার করা হ'ত হাঁস। এরা যে কোন রকমের আবহাওয়ায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে উড়ে চলতো। চীনের সরকারী আমলারা হাঁসের কাজে এরূপ গুরুত্ব আরোপ করতো যে আজ পর্যন্তও চীন সরকারের ডাক বিভাগীয় পতাকায় উড়ন্ত হাঁসের ছবি বহন করা হয়।

আজও যুক্তরাষ্ট্রের সমর সঙ্কেতবাহিনী কর্তৃক উড়ন্ত বার্তাবাহক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক সংবাদ আদান

প্রদানের জন্য সংবাদবাহক কবুতর ব্যবহার করা হয়। এই সব কবুতর প্রজনন ও তাদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি সংস্থা রয়েছে। যদিও শান্তির প্রতীক, তবু এই সব বীর পাখিদের কয়েকটি যুদ্ধের সময়ে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।

একটির কথা আমার মনে আছে। নতুন সৈন্যপ্রেরণের জন্য জরুরী বার্তা বহন করে চলেছিল সে; পথের শিকারী বাজ তাকে আক্রমণ করে। পর্যুদস্ত ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় আর উড়বার শক্তি ছিল না তার। সেই সাহসী পাখিটি তখন মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে, ডানা ঝাপটিয়ে পাঁচ মাইল দূরবর্তী নির্দিষ্ট খাঁচার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে তার আহত পায়ের সঙ্গে বাঁধা বার্তা বিলি করার কথা।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ ধ্বনি, দৃশ্য এবং মানুষ ও প্রাণীর দ্রুত চলাচলের মাধ্যমে নানা ধরনের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেছে। এ সবেরই ভিত্তি ছিল সঙ্কেত, চক্ষু ও কর্ণে গ্রাহ্য উভয়বিধ। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের কণ্ঠস্বর কয়েক শ' গজের বেশী দূরে পেঁ ৗছতে পারে না বলে ঐ সমস্ত প্রতীকও মানুষের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। তথাপি মানুষের উদগ্র কামনা ছিল যাদের তারা ভালবাসে, ঘৃণা করে অথবা যাদের সঙ্গে সমাজে, রাজনীতিতে, ব্যবসায়ে বা সামরিক জগতে তাদের কাজ কারবার চালাতে হয়, তাদের কাছে দিগন্তের ওপারে বা পৃথিবীর সুদূরতম কোণে কোণে তাদের কণ্ঠস্বর বা কথিত বাক্য পৌছে দেওয়া।

অবশেষে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, দূরত্ব অগ্রাহ্য করেও কথা বলা ছিল যাদের কামনা, তাদের মুখ থেকে সে বাধা অপসৃত হয়ে গেল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ—সেদিন আমাদের মন্থরগতি পৃথিবী চমকে উঠল খবর শুনে—বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-মহলে প্রায় অপরিচিত এক তরুণ বস্টনে ১০৯নং কোর্ট স্ট্রীটে এক জীর্ণ দালানে সংলগ্ন তারের মধ্য দিয়ে তার কণ্ঠস্বর, তার কথা দূরে প্রেরণ করেছেন। তারের অপর প্রান্তে বহু দূরবর্তী এক কক্ষে বসে তাঁর সহকারী প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে ভীত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনিই সুস্পষ্ট ও সুসংলগ্ন টেলিফোন বার্তা প্রথম গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করলেন। মানব-প্রগতির ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী মুহূর্তরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এই তরুণ আবিষ্কারকের নাম আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল। ১৮৪৭ সনের মার্চ মাসে স্কটল্যাণ্ডে এডিনবরাতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তিনি আলেকজাণ্ডার মেলভিল বেলের পুত্র; ইনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও বিশুদ্ধ বাচন সম্বন্ধে বহু পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। তাঁর মা এলিজা গ্রেস সাইমণ্ড্স ছিলেন রাজকীয় নৌবহরের এক চিকিৎসকের কন্যা। তিনি সুগায়িকা ছিলেন, সঙ্গীতে তাঁর বুৎপত্তিও ছিল যথেষ্ট। গ্রেহাম যখন মাত্র বার বছরের সেই সময়ে তিনি তাঁর শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। গ্রেহাম জন্মসূত্রে মায়ের কাছ থেকে তাঁর সঙ্গীত-প্রীতি লাভ করেন। তাঁর ঠাকুরদাদা আলেকজাণ্ডার বেলও সু-বাচক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; তিনি তোত্‌লামি, অস্পষ্ট-বাচন ও অন্যান্য বাগ্‌-বৈকল্যের চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

দশ বছর বয়সের মধ্যেই বালক গ্রেহাম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন। গৃহস্থালির পরিত্যক্ত খুঁটিনাটি দ্রব্যাদি

মেরামত করে তিনি যত আনন্দ পেতেন তত আর কিছুতে নয়। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিল একটি ভাঙ্গা ঘড়ি; এর অংশগুলি মাঝে মাঝে খুলে ফেলে আবার জুড়ে তুলতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর বয়স যখন প্রায় চোদ্দ, তখন তিনি এডিনবরাতে একটি ময়দার মিল দেখতে যান। মিলের মালিক জানতো, তাঁর এই তরুণ পরিদর্শকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-প্রবণতা আছে; তাই সে আধা-বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল—গ্রেহাম গম ভাঙ্গাবার আগেই গমের তুষ ছাড়াবার কোন উপায় বাতলে দিতে পারে কিনা। গ্রেহাম প্রশ্নটিকে বিদ্রূপ বলে ভাবতে পারেননি, তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর তিনি অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের আত্ম-প্রত্যয় সহকারে জবাব দিলেন, 'আপনি যদি গমগুলি শক্ত ঘুরন্ত ব্রাশের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিতে পারেন, তবে সব খোসা আগেই পড়ে যাবে।' মিলওয়ালাটি ভাল বুদ্ধি কাজে লাগাতে জানতো; বহু বৎসর সে গম থেকে তুষ ছাড়াবার জন্য সাফল্যের সঙ্গে ঘুরন্ত ব্রাশ ব্যবহার করেছে।

মাত্র পনর বছর বয়সের সময় গ্রেহাম বাক্‌কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁর ভাই আর তিনি দুজনে একটি মানুষের খুলির মডেল তৈরি করে তাতে একটি নকল বাগ্‌যন্ত্র সংযুক্ত করেন; যন্ত্রটা চালাতেন তাঁরা হাপরের সাহায্যে। শিশুর বাক্ প্রচেষ্টার জীবন্ত নকলধ্বনি তুলতেন তাঁরা এই যন্ত্রে। এর করুণ 'মা মা! মা মা!' ক্রন্দন এত জীবন্ত ছিল যে প্রতিবেশীরা হারানো শিশুর কান্না মনে করে তার সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলে আসতো। এই সময়েই এই বিজ্ঞানী তাঁদের পোষা টেরিয়ারকে একটানা ঘেউ ঘেউ করিয়ে তার মুখ ও বাগ্‌যন্ত্রকে এমন ভাবে পরিচালিত করতেন যে কুকুরের মোটামুটি নকল ধ্বনি উৎপন্ন হ'ত। গ্রেহামের সহায়তায় কুকুরটি যখন বলত, 'আও-আ-উ গ্যাম্‌মা?' (How are you grandma?), তাঁর বন্ধুরা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যেত।

যেহেতু তাঁকে খানিকটা অলৌকিক প্রতিভাধর বলে মনে হ'ত, তাই এডিনবরার একটি ছেলেদের স্কুলে তাঁকে সাদরে ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পরিবর্তে সেখানে তিনি সঙ্গীত ও সুবাচন শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের পরে যদিও তাঁর বিজ্ঞানচর্চার সময় আর বড় থাকতো না, তবু গ্রেহাম জিহ্বা ও মুখ-গহ্বরের পারস্পরিক সংস্থান পরিবর্তন দ্বারা কী করে বিভিন্ন স্বরধ্বনি-গুলি উচ্চারিত হয় তা নির্ণয়ের জন্য পরপর অনেকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করেন। লণ্ডনের একজন বিজ্ঞানী এই সব পরীক্ষার বিবরণ পড়ে-ছিলেন, তিনি গ্রেহামকে ভন হেলম্‌হোল্‌ৎসের লেখা 'স্বরের অনুভূতি' বইখানা পড়তে বললেন। ইনি বৈদ্যুতিক উপায়ে কম্পিত 'টিউনিং ফর্কের' সুরকে সংশ্লেষিত স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

বইখানা বেলের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এই বই পড়ার পরে মানুষের কথা টেলিগ্রাফ করার সম্ভাবনা তাঁকে পাগলামির মত পেয়ে বসল। এ নিয়ে কোন পথে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। তবে তিনি মর্সের ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের কথা জানতেন ; টেলিগ্রাফের ব্যবহার তখন দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছাড়াই তিনি তাঁর এই অতি প্রিয় বিষয় নিয়ে চিন্তা করে চললেন।

প্রায় এক বছর পরে তিনি সমারসেটশায়ার কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন ; এখানে তিনি এমন একজন সহকর্মী পেলেন যিনি ব্যক্তিগত খেয়ালবশে তড়িৎসম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রেহামও এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করলেন। জ্ঞান বাড়াবার জন্য তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বন্ধুর কক্ষ পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন বসালেন। শীগগিরই এই দুই তরুণ শিক্ষক মর্স-সাঙ্কেতিকে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। শিক্ষা-কর্মের অবসর সময়ে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাবি টিপে টিপে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করতে থাকতেন।

একদিন সান্ধ্যাবেলা এই দুই নকল টেলিগ্রাফার তাঁদের নৈশ

আলাপ চালাচ্ছিলেন ; সে আলাপ ক্রমে ব্যক্তিগত আলোচনায় পৌঁছয়, অবশ্য তাতে দোষের কিছুই ছিল না। একজন অধ্যাপক সম্বন্ধে আলাপ চলছিল। আবহাওয়া ছিল উষ্ণ, সব জানালা ছিল খোলা। তাঁদের যন্ত্রের 'টরে টক্কা' শব্দ সুস্পষ্ট ভেসে আসছিল পাশের ঘরে। দুর্ভাগ্যক্রমে পাশের ঘরটিই ছিল সেই অধ্যাপকের, আর তিনি এক সময়ে ছিলেন টেলিগ্রাফ কর্মী। মর্স-সাঙ্কেতিক জানা থাকাতে তিনি তাঁর নামের আদ্য অক্ষরগুলি উল্লিখিত হচ্ছে বুঝতে পারলেন। তারপর সমাজের এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্বন্ধে গুপ্ত আলোচনাও তাঁর কানে এল। বেলের ঘর থেকে তাঁর বন্ধুর ঘরে তারগুলি কোথা দিয়ে গেছে জানতেন বলে সেগুলি তিনি কেটে দিলেন। বেল তখনও তাঁর টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কাছে বসে ছিলেন। তারপর তিনি বেলের সামনে গিয়ে গম্ভীর চালে বললেন, 'দেখ বেল, অন্য মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সময় কোন গোপন সাঙ্কেতিক ব্যবহার করতে পারলেই ভাল হয় না কি ?'

একটু অপ্রতিভ এবং ক্রুদ্ধ হলেন বেল। পরে তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেলেন লণ্ডন। তাঁর পিতা তখন আমেরিকায় ভ্রাম্যমাণ বক্তা হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ; লণ্ডনে তিনি পিতার কাজ তদারক করতে শুরু করলেন। বাড়তি কাজ হিসেবে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগ্‌যন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। বেশী কাজে চাপে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তাঁর দুটি ভাই ইতোমধ্যেই যক্ষ্মায় মারা গেছে। ডাক্তারেরা সাবধান করে দিলেন, তাঁরও ঐ রোগ হবার আশঙ্কা রয়েছে।

তাঁর পিতা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত লোক ছিলেন। ইতোমধ্যেই তিনি গুরুতর আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও ব্রিটেনের আর্দ্র আবহাওয়া ছেড়ে কানাডায় অণ্টারিওতে পরিবারবর্গকে সরিয়ে নেওয়া স্থির করেছিলেন।

কিছুদিন পরে গ্রেহাম বেলও সেই 'নতুন'পৃথিবীতে' পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হওয়া স্থির করলেন। তিনি লণ্ডনে থেকে এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিলেন যা দিয়ে একই তারে একসঙ্গে কয়েকটি টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব হবে। কয়েকমাস ধরে অনবরত অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুই সেট 'টিউনিং ফর্ক' নিয়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। এক সেট থেকে একসঙ্গে কয়েকটি সুর প্রেরণ করে গ্রাহক সেটে সুরগুলিকে পৃথকভাবে ধরবার চেষ্টা করছিলেন। এর নাম দিয়েছিলেন তিনি 'ঐকতানিক টেলিগ্রাফ।' বিজ্ঞানী মহলে বা ব্যবসায়ী মহলে তাঁর এই প্রচেষ্টা বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেনি। হতাশ হলেও নিরুৎসাহ হননি তিনি, তাই দিনরাত্রি তাঁর টিউনিং ফর্ক নিয়ে কাজ করে চলেছিলেন।

একদিন সকালে তিনি তাঁর বাবার এক চিঠি পেলেন। বস্টনের সম্পূর্ণ বধিরদের এক স্কুলের অধ্যক্ষ 'দৃশ্য-বাচন' সম্বন্ধে তার শিক্ষকদের জন্য একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করতে চান। তাঁর নিজের পক্ষে বস্টন যাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি গ্রেহামকে ঐ বক্তৃতার ভার গ্রহণ করতে বলেছেন। চিঠি পড়া শেষ না হতেই গ্রেহাম মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি বস্টনে যাবেন। জীবনের চরম সুযোগ এসে গেছে ; যে স্যামুয়েল মর্সের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না, সেই মর্সের উজ্জ্বল সাফল্যের পথ অনুসরণ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

এক সপ্তাহ পরে তিনি গ্লাসগোতে এক সমুদ্রগামী জাহাজে চড়ে বসলেন। একটি মাত্র চামড়ার বাক্সে (সেকালের স্যুটকেশ) তাঁর সব সম্পত্তি পুরে নিয়েছেন তিনি। গ্লাসগো তখন এক অতি-ব্যস্ত শিল্পনগরী ; আমেরিকার যে কোন শহরের চেয়ে তার লোকসংখ্যা বেশী। ক্লাইড নদীর তীরে অবস্থিত গ্লাসগো—নদীর ধারে ধারে সব সারিবদ্ধ জাহাজের ডক, চামড়ার কারখানা, ফ্যাক্টরী ও গুদাম। আঁকাবাঁকা নদীপথে টেনে টেনে জাহাজ বার করা হল ক্লাইড নদীর

খোলা বিস্তৃত মোহনায়। তরুণ দেশত্যাগী জাহাজের রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবছিলেন, তাঁর এই যাত্রা বুনো-হাঁস শিকারের মত ব্যর্থ হবে কিনা!

অতল বিস্তৃত সমুদ্রের জলে এসে তাঁদের তিন মাস্তুলওয়ালা জাহাজ দু'পাশের গুণটানা নৌকাগুলি খুলে দিল। দাঁড়ের ঝুলানো পালগুলি খুলে দেবার সুবিধার জন্য একজন খালাসী ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যাত্রীদের দলে দলে উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। ডেকের উপরে ঘর্মায়মান নাবিকেরা পাল তুলবার, টানা বাঁধবার নানারকম দড়িদড়া নিয়ে টানাটানি করছিল, সেখানে শৃঙ্খলার মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে হৈচৈ, বিশৃঙ্খলা যেন। নানা রকমের হুকুম, অস্পষ্ট শপথ—কর্কশ কণ্ঠের চীৎকার। সবার উপর দিয়ে উঠেছে নাবিকদের সতেজ ছন্দের দড়ি টানবার বা ক্যাপস্টান বাঁধবার একতান গান।

নিভু'ল জ্যামিতিক মাপে সব পাল তুলে যথাস্থানে খাটানো হয়ে গেল। সতেজ হাওয়ার টানে তুষারশুভ্র পালগুলো ফুলে ফেঁপে উঠল—জাহাজটাকে মনে হতে লাগল সুউচ্চ গম্বুজের মত। এবার নিজেরই শক্তিতে জীবন-স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে সে ছুটে চলল সুদূর যাত্রাপথে। জাহাজের সামনে যেন ক্রীড়াচ্ছলে শুভ্র পালকের মত জলের ঝলক ছিটকে উঠতে লাগল—যাত্রীরা দৌড়ে আড়ালে পালাতে শুরু করল। সমুদ্রের নোনা আস্বাদ, আকাশের স্বচ্ছ নীল, জাহাজের রান্নাঘর থেকে টুকরাটাকরির আশায় জাহাজের সাথে সাথে চক্রাকারে উড়ন্ত গাঙচিল—সব কিছু যেন তাঁর হৃদয়ে নতুন আশার, নবীন সাহসের সঞ্চার করছিল।

লম্বা জাহাজী বহির্বাস পরিহিত মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক তরুণ গ্রেহামের কাছে এগিয়ে এলেন। অমায়িকতার সঙ্গে তিনি বললেন, 'আমার নাম ম্যাকিন্‌টশ ; স্টুয়ার্ড বলল আমরা দুজনে একই কেবিনে থাকছি। শুনলাম, তোমার নাম বেল। আমি একসময়ে এক ডাঃ আলেকজাণ্ডার বেলকে চিনতাম। সুন্দর মানুষ। চমৎকার

ভদ্রলোক। বাচন সম্বন্ধে কী যেন তিনি করতেন! তিনি কি তোমার কোন আত্মীয় ছিলেন?'

'তিনি ছিলেন আমার ঠাকুরদা।'

লোকটি একটু বিস্মিত হলেন। 'আরে, চমৎকার হয়েছে! তবে তো বেশ থাকবো দুজনে একসঙ্গে।'

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে খারাপ আবহাওয়ার জন্য উভয়েই তাঁদের কেবিনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঝড়ের সময়ে চলমান জাহাজের নিয়মানুসারে সব যাত্রীকে জোর করে আটকে রাখা হচ্ছিল।

একদিন সন্ধ্যায় তীব্র উত্তর-পূর্ব হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছে জাহাজ। বেল তার সঙ্গীকে প্রশ্ন করল, 'আপনি নিজে কি করে থাকেন?'

ম্যাকিন্‌টশ বললেন, 'নিজে বিশেষ কিছুই করি না। ক্লাইডের ধারে একটি বড় জাহাজ-নির্মিত কোম্পানির আমি প্রেসিডেন্ট। এই জাহাজখানাও আমাদের একটি কারখানায় নির্মিত হয়েছে। এর মাস্তুল সেগুনের, সাদা ওকের খোল, হলুদ পাইনের পাটাতন—মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব সুদৃঢ় করে একে গড়া হয়েছে। তাছাড়া টাকায় যতটা সম্ভব, আরামের ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা এতে রয়েছে।'

ঠিক সেই সময়ে মারমুখী সমুদ্র ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজ উল্টে দেবার মত করে ফেলল। আলগা যা কিছু ছিল ডেকের উপর গড়াতে শুরু করল। সন্নিহিত সব কেবিন থেকে শোনা যাচ্ছিল স্ত্রীলোকের চেঁচামেচি ও পুরুষের চীৎকার; বাইরে চলেছে ঢেউয়ের উন্মত্ত গর্জন, আর পাল ও দড়াদড়ির মধ্য দিয়ে ঝড়ের দাপাদাপি। আগেও অনেকবার এই একই ক্ষেপামি প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে, এবারও তাই।

কিছুক্ষণ পরে যখন জাহাজ ও যাত্রীরা আবার ধাতস্থ হল, জাহাজ নির্মাতা ভদ্রলোক গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আমি যা বলছিলাম, দেখলে? এর চেয়ে কমজোর জাহাজ হয়তো এ ধাক্কা সামলাতে পারতো না।'

বেল খুব মুগ্ধ হয়েছেন বলে মনে হল না। গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তিনি, তাঁর সঙ্গী কী বলছিলেন, তা যেন শুনতেই পাননি। দু'চার মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, 'আমি ভাবছি সেই সব অসংখ্য বড় বড় জাহাজের কথা—এমন কত জাহাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে গেছে। অসংখ্য মানুষ উদ্ধারের সব আশা হারিয়ে তলিয়ে গেছে অতল সমুদ্রে। মনে করুন কোন অন্ধকার বা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রে যদি কোন তুষারশৈলের সঙ্গে জাহাজের সংঘর্ষ হ'ত, বা কোন মগ্ন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যদি আমাদের জাহাজের খোল ফেটে যেত, তাহলে? জাহাজে আগুন লেগে যদি তা আয়ত্তের বাইরে চলে যেত? নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমরা কী করতে পারতাম? দুর্ভাগ্য হল এই যে, হয়তো কোন সাহায্যকারী জাহাজ কয়েক লীগ দূরে থেকেও আমাদের এই বিপদের কথা জানতে পারল না, কারণ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। স্থলে মর্সের বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ মুহূর্তের মধ্যে শত শত মাইল দূরে বার্তা প্রেরণ করছে।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধৈর্য হারিয়ে বলে ফেললেন, 'কিন্তু মর্সের টেলিগ্রাফের জন্য বিভিন্ন স্থানে তার বসানো আছে। আমরা তো সমুদ্রের মধ্যে টেলিগ্রাফের খুঁটি পোঁতার আশা করতে পারি না।'

বেল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আমার কথা শুনে রাখুন। সেদিন দূর নয় যখন বহুদূরের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তার বা অন্য কোন কঠিন মাধ্যমের প্রয়োজনই হবে না। নতুন নতুন বৈদ্যুতিক বিষয় প্রতিদিন আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিদ্যুতের যুগ ঘরের কোণে এসে পৌঁছেছে। পূর্ণাহিত মেঘ থেকে বিদ্যুৎশিখা যদি বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে গির্জার বা উচ্চ সৌধের চূড়ায় এসে পেঁছতে পারে, এ কথা ধারণা করা কি অসম্ভব যে বিজ্ঞান হয়তো ক্ষুদ্রতর তড়িৎ-প্রবাহকে দূরতম স্থানে প্রেরণ করতে পারবে?'

আবার একটি তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে জাহাজ আগা থেকে পাছা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল।

পুরো পোশাক-পরা অবস্থায় শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে দুই বন্ধু তাঁদের বার্থে দেহ এলিয়ে দিলেন; আশা করলেন নিদ্রার মধ্যে এই অশান্তি ও উদ্বেগ থেকে খানিকটা মুক্তি পাওয়া যাবে। ম্যাকিন্‌টশ সমুদ্রে মানুষ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল হাপরের মত। অপেক্ষাকৃত কম মন্দভাগ্য বেল আধো-অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে জেগে রইলেন। নতুন দেশে তাঁর ভাগ্যে কী আছে? সাফল্য না অসাফল্য, দারিদ্র্য না সম্পদ, সুখ না দুঃখ, সম্মান না প্রত্যাখ্যান?

সকালে সমুদ্র শান্ত হয়ে এল, তার উপর এসে পড়ল নতুন সূর্যের আলোক-রশ্মি। ঝড় একেবারে পড়ে গেছে, বইছে স্নিগ্ধ হাওয়া। উঁচু থেকে তীরভূমি দেখা গেছে—দুঃসাহসী যাত্রার সমাপ্তি ঘনিয়ে এল।

বেল আর তাঁর জাহাজ নির্মাতা বন্ধু পাশাপাশি ডেক-চেয়ারে বসেছিলেন—সুদূর তীররেখার উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ক্যাপ্টেন ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল; ওদের সামনে এসে থামল। বেশ অমায়িক কণ্ঠে বলল, 'বন্দরে ভিড়বার পক্ষে বড় সুন্দর দিন। এই হাওয়াটুকু যদি থাকে তবে চায়ের সময়ের মধ্যে আমরা জেটিতে নোঙর করবো। ভারী দুঃখিত, এমন বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে আপনাদের কাটাতে হল।' সে চলে গেল তার ঘোরা শেষ করতে।

ম্যাকিন্‌টশ বেলের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি বস্টনে কোথায় থাকবে ঠিক করেছ, বলতো?'

উত্তর হল, 'তা জানলে তো খুবই ভাল হ'ত। এদেশে এই আমার প্রথম আসা। বেশী খরচ হবে না থাকতে, এমন কোন জায়গার কথা আপনি বলতে পারেন কি?'

'বরং আমার সঙ্গেই এস না কেন? আমি সাধারণত শহরের একটি

ছোট হোটেলে উঠি। হোটেলটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আরাম-দায়ক, আর খরচাও খুব কম।'

'আমার পক্ষে ওটা বেশ ভালই হবে বুঝতেই পারছেন! আমার সঙ্গে টাকা পয়সা খুব কম। অল্প খরচ করেই বেশীদিন আমাকে থাকতে হবে।'

'খাঁটি স্কটস্‌ম্যানের মতই বলেছ! কিন্তু দেখো, তোমার স্বপ্ন যেন হারিয়ে না যায়। স্বপ্ন যখন সত্য হয়ে ওঠে তাকেই বলি আমরা সাফল্য; আর কৃতকর্মের প্রতীকই হল সম্পদ। তোমার কাজ যদি তোমার স্বপ্নের ভগ্নাংশমাত্রও সফল হয়, তবে আমার তহবিল থেকে পঞ্চাশ বা একশ পাউণ্ড আমি তোমাকে অনায়াসে দেব।'

সেই রাত্রিতে তুজনে বস্টনে অতি কোমল পালকের শয্যার আরাম ভোগ করছিলেন। সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যস্ত বেল কিন্তু তখনও জাহাজের দোলানি অনুভব করছিলেন। সমুদ্রের তুঃস্বপ্নে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছিল।

পরদিন খুব সকালে তিনি বয়লস্টন ও ট্রিমণ্ট স্ট্রীটে এবং সুরক্ষিত বস্টন কমনের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মানুষের শিথিল গতি ও সংস্কৃতির অনির্দেশ্য পরিবেশ তাঁকে এডিনবরার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। পথে লোকজন কম, পথে পথে টইল দিতে লাগলেন তিনি—নিজের গবেষণার কাজ চালাবার পক্ষে সুবিধাজনক অল্প খরচের একটি স্থান খুঁজে বার করবেন আশায়।

একটি জোয়ান পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলেন বেল, 'একটু খুঁটিনাটি মেরামতী ধরনের কাজ চালাতে পারি এমন কোন বাড়ির খোঁজ দিতে পারো কি ভাই?"

সেকালে পুলিসকে বলা হ'ত 'পাহারাওয়ালা'। তাদের বিটের চারপাশের সব জায়গার সঙ্গে তাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকতো।

অফিসারটি বলল, 'তা আমি পারি। এই পথ দিয়ে একটু

গেলেই একটি পুরানো বাড়ি আছে, একেবারে খালি—ইঁদুরের বাসা। যদি চান, সামান্য ভাড়ায় সব ঘর ভাড়া নিতে পারেন সেখানে।'

১০৯নং কোর্ট স্ট্রীটের বাড়িখানা পুরাতন ধরনের, ভাঙ্গাচোরা আর অনাদৃত। উপরের তলায় চিলেঘরের সঙ্গে পাশাপাশি দুখানা ঘর পেলেন বেল তাঁর সঙ্গতির মধ্যে। তরুণ বয়স, দেহে সামর্থ্য যথেষ্ট। সাফল্য চিন্তায় বিভোর হয়ে সেই গৃহের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল অপসারণের কঠিন কাজেও একটু দমলেন না বেল। এই স্থান হবে তাঁর স্বপ্ন দেখবার, পড়াশুনা করবার আর কাজের আশ্রয়।

যে উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় আসা স্থির করেছেন, সেই বধিরদের বিদ্যালয়ের কথাও তিনি ভুলে যাননি। সেখানে গিয়ে তিনি অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের নিকট থেকে সাদর অভ্যর্থনা পেলেন। যত সময় যেতে লাগল তাঁর বক্তৃতামালাও তত সমাদৃত হতে লাগল। তিনি চারশ'র বেশী ইংরেজী শব্দ শেখাতে সমর্থ হলেন। অন্য শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাঁর ছাত্রগণ এটা দুই তিন বছরের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারেনি।

ইতোমধ্যে ঘটনাক্রমে টমাস এ. ওয়াটসন নামক এক তরুণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। কারিগরী প্রতিভার খ্যাতি ছিল তাঁর খানিকটা। তাঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হল। একে অন্যকে বিশ্বাস করে তাঁরা তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা আর সমস্যার কথা আলোচনা করতেন। সমস্যা ছিল তৎকালে সবই প্রায় আর্থিক।

তখন তাঁর তহবিল ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তবু বেল চিলে-কোঠার সেই ঘরে চলনসই একটি টেলিগ্রাফ লাইন বসাবার পক্ষে যথেষ্ট বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কেনার ব্যবস্থা করলেন। একটি গ্যাল-ভ্যানিক ব্যাটারী, গৃহে তৈরী একটি প্রেরকযন্ত্র (সাধারণত একে বলে 'চাবি') একটি গ্রাহকযন্ত্র (টেলিগ্রাফারদের কাছে 'বাগ' নামে পরিচিত), কয়েক শ' ফুট তামার তার, কয়েকখানা যন্ত্রপাতি আর কিছু ধাতুনির্মিত এটা-সেটা—এই হল তাঁদের কারখানার যন্ত্র

একটি বড় রান্নাঘরের টেবিল হল কাজের টেবিল ; কয়েকখানা ভাঙ্গা চেয়ার ; কয়েকখানা কারিগরী পুস্তক নিয়ে হল তাঁর ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরীর আসবাবপত্র।

বেল ও ওয়াটসন বহু রাত্রি একত্রে কাজ করে কাটালেন। তাঁদের আলোচনা অনিবার্য ভাবেই টেলিগ্রাফি ও তার সামনে উন্নতির যে বিরাট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে সেই বিষয়ে এসে পেঁছিতো।

এমনি এক রাত্রিতে আলোচনার সময় বেল কিছুদিন ধরে যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন তা বর্ণনা করে শোনালেন। খুবই ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল তাঁকে তখন ; তবু তিনি একটি পেন্সিল নিয়ে কাগজে একটি জটিল বৈদ্যুতিক ছক ও একটি অদ্ভুত যান্ত্রিক চিত্র এঁকে ফেললেন। তাঁর আশা, এই যন্ত্র দিয়ে একই তারের মাধ্যমে কয়েকটি মর্স-বার্তা একযোগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এর নাম বললেন তিনি 'ঐকতানিক টেলিগ্রাফ'। আসলে, নিজে না জেনেই তিনি টেলিফোনের তত্ত্ব উদ্ভাবন করে ফেলেছেন।

ওয়াটন মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রতিভা চিনতে তাঁর দেরী হল না ; তিনি বুঝলেন বেল কেবল সামান্য জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবার মানুষ নয়, এই তরুণ স্কটস্‌ম্যানের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। তিনি সাগ্রহে বললেন, 'আমি কি করবো তোমাকে বলছি, বেল। কেমন করে বানাতে হবে যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো, তবে এ যন্ত্র আমি তৈরী করে দেব।'

'ধন্যবাদ ওয়াটসন,' বেলের কণ্ঠ আনন্দে অনুরণিত হয়ে উঠল। তাঁরা একে অন্যের হাতে হাত তুলে নিলেন আবেগভরে ; শুরু হল আজীবন বন্ধুত্ব ও অংশীদারি।

বেল তাঁর নতুন যন্ত্রের তত্ত্ব বর্ণনা করলেন। তিনি তাঁর নতুন সহকারীকে বললেন, 'আমাদের চারিপাশের বায়ুর ঘনত্ব যেমন তার ভিতর দিয়ে শব্দ চলবার সময় পরিবর্তিত হয়, তেমনি এমন কোন যন্ত্র যদি পাই যা দিয়ে সেই সময় তড়িৎ-প্রবাহের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি

করা চলে তবে আমি যে কোন শব্দ, এমন কি কথাও টেলিগ্রাফ করতে পারি।'

যদিও সমস্যাটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তাঁর, তবু কী উপায়ে প্রয়োগক্ষেত্রে তার সমাধান সম্ভব তা বেল তখনও জানতেন না। পুরো এক বছরের ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে দুজনে মিলে কাঠ ও ধাতুর টুকিটাকি দিয়ে কয়েকটি যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম হলেন। মূলত এগুলি ছিল সাধারণ বৈদ্যুতিক শব্দকারী যন্ত্র ;—এতে প্রচলিত ধাতুর কম্পনীর বদলে পুরানো একটা অর্গান থেকে ইস্পাতের সরু পাত লাগানো হয়েছিল। বৈদ্যুতিক কম্পন শুরু করালে পাতগুলি থেকে এক ধরনের কোমল সঙ্গীতের ধ্বনি উত্থিত হ'ত।

ঐ অপরিণত প্রেরকযন্ত্রগুলি ওয়াটসনের কারখানাঘরে স্থাপিত হয়েছিল। পাশের ঘরে বেলের টেবিলেও একই ধরনের অপরিণত একটি গ্রাহকযন্ত্র স্থাপিত হল। নির্দিষ্ট মুহূর্তে ওয়াটসন যন্ত্রের একাংশ চালু করবার জন্য একটি চাবি টিপে ধরলেন। কিছুই ঘটল না। বারে বারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যন্ত্র থেকে একটি টিক্ শব্দও বেরুল না। সাবধানে সব কিছু আবার পরীক্ষা করার ফলে দেখা গেল, সংযোগ-বিন্দুতে পাতটি অত্যন্ত এঁটে লাগানো হয়েছে। কাজেই ওয়াটসন নখ দিয়ে সেটা একটু তুলে দিলেন—যাতে কম্পন শুরু হতে পারে। বেল নিজের ঘরে বসে তারের মধ্য দিয়ে সেই অস্বাভাবিক শব্দ শুনলেন। পাতের কম্পনজাত ঝঙ্কার ও অনুরণনের বৈশিষ্ট্যও তাঁর কানে ধরা পড়ল। খানিকটা উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন বলে তিনি কোন উত্তেজনার লক্ষণ দেখালেন না, কিন্তু তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। মানুষের ইতিহাসে প্রথম তিনিই শুনতে পেলেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গবাহিত ধ্বনির ভাঙাচোরা। সেই মুহূর্তে 'ঐকতানিক টেলিগ্রাফ' সাফল্যমণ্ডিত হল ; টেলিফোনের ক্রমবিকাশে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা ধরে বেল সেই চিলেকোঠার মেঝেতে গভীর

চিন্তায় মগ্ন অবস্থায় পদচারণা করে বেড়াতে লাগলেন। মাঝে মাঝে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কী যেন সব টুকে রাখছিলেন, যে যন্ত্রের পরিকল্পনা করছিলেন মনে মনে তার ছবিও আঁকছিলেন। একটি জটিল ধ্বনিকে তারের মধ্য দিয়ে প্রেরণে যখন সক্ষম হলেন, তখন তাঁর বিশ্বাস হল যে মানুষের কণ্ঠের বৈশিষ্ট্যও ঐ ধ্বনির মাধ্যমে রূপায়িত করা সম্ভব। কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন, আগে তিনি এতটা কল্পনা করতে পারেননি।

এরপরে বেল ওয়াটসনের কারখানায় ঢুকে একটি খসড়া স্কেচ্ বেঞ্চের উপর রাখলেন। বললেন, 'মনে হয় এটা সফল হবে।' তারপর তিনি যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। কিভাবে সেই সব অংশে জোড়া লাগানো হবে তাও বললেন। ঐকতানিক টেলিগ্রাফের যন্ত্রের মত এটিও তৈরী হবে একটি চুম্বকের সঙ্গে একটি পাত সংলগ্ন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে পাতের আলগা দিকটা খঞ্জনির মত একটি ক্ষুদ্র ঢাকের ছাউনির সঙ্গে আটকানো থাকবে।

মানুষের কণ্ঠধ্বনিদ্বারা ঢাকের ছাউনিতে কম্পন সৃষ্টি করা হলে চুম্বকের প্রান্তে সংলগ্ন পাতেও কম্পন জাগবে। তার ফলে বৈদ্যুতিক সার্কিটে কণ্ঠধ্বনিজাত বায়ুতরঙ্গের মত তরঙ্গময় তড়িৎ-প্রবাহ চালু হবে। গ্রাহকযন্ত্রটিও একই সাধারণ ছকে তৈরী।

কিছুদিন পরে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রগুলি তাদের স্ব-স্ব ঘরে স্থাপিত হল। প্রেরকযন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াটসন জোর গলায় গুনতে লাগলেন 'এক দুই, তিন, চার—' ইত্যাদি, তারপর বর্ণমালার বর্ণগুলি একে একে পড়ে গেলেন। গ্রাহকযন্ত্রের কাছে কান খাড়া করে ছিলেন বেল, হতাশার ছায়া নেমে এল তাঁর মুখে। ওয়াটসনের গলার সুর ও বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার শোনা গেল, কিন্তু কথাগুলি বুঝা গেল না।

তাঁদের সম্মুখে বিস্তৃত দুরূহ পথে এই পরীক্ষার ফলে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন তাঁরা। তার-পথে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে;

একদিন এই কণ্ঠস্বর বোধগম্য শব্দের রূপ গ্রহণ করবে—তারপরেই সাফল্য।

এই আশায় উদ্দীপিত হয়ে বেল মাসের পর মাস ঘরে আবদ্ধ থেকে, বিনিদ্র রজনী যাপন করে, সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে পরীক্ষা কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অন্যান্য দিনের মতই একদিন তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণা কার্যের প্রেরকযন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলেন—বিশেষ ফল কিছুই হচ্ছিল না। সহসা বিদ্যুচ্চমকের মত একটি চিন্তা খেলে গেল তাঁর মনে। তিনি ওয়াটসনকে ডাকলেন।

'ঢাকের আচ্ছাদনের কেন্দ্রস্থলে দুই ইঞ্চি এক টুকরা তামার তারের একপ্রান্ত এঁটে দিতে হবে। আরেক প্রান্তের নীচে একটি ক্ষুদ্র পাত্রে অল্প একটু জলমিশ্রিত সালফিউরিক এসিড বসিয়ে দিতে হবে—যাতে ঢাকের আচ্ছাদনে যখন কম্পন জাগবে তখন তারের প্রান্তের সঙ্গে এসিডের মৃদু মৃদু ছোঁয়া লাগে।

সেইদিন রাত্রিতেই তাঁর নির্দেশমত ওয়াটসন যে প্রেরকযন্ত্র তৈরী করে দিলেন, বেল সেটা সামনে নিয়ে বসলেন। অপর প্রান্তে ওয়াটসন সাগ্রহে শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলেন। পরীক্ষার জন্য সব কিছু প্রস্তুত।

কাজে-কর্মে বেল ছিলেন সর্বদাই সুশৃঙ্খল স্বভাবের। শেষ মুহূর্তে তিনি টেবিলের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রাখতে গেলেন। তাঁর অসাবধানতা, অথবা হয়তো ভাগ্যই সালফিউরিক এসিডপূর্ণ নলটি উল্টে ফেলে দিল, এসিডটা গড়িয়ে পড়ল আবিষ্কারকের ট্রাউজারের উপর। চামড়ার উপরে এসিডের তীক্ষ্ণ দংশন অনুভব করে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি 'ওয়াটসন, এখানে এস, বড় দরকার।'

এক মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে ওয়াটসন ঘরে ঢুকলেন 'ডাঃ বেল, আপনি যা বলেছেন তার প্রত্যেক কথা আমি স্পষ্ট শুনেছি।'

বেল তাঁর যন্ত্রণার কথা প্রায় ভুলে গেছেন তখন। বহু বৎসরের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। যে নৈঃশব্দ্যের প্রাচীর মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এতকাল, তা চূর্ণ হয়েছে। এসিডে ভেজা পোশাকের কথা ভুলে গিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীর করমর্দন করলেন। বললেন, 'সাবাস্ ওয়াটসন! তুমি না থাকলে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেত। আজ থেকে ভাগ্যে যাই থাক না কেন, আমরা অংশীদার!'

এই অংশীদারি ছিল দারিদ্র্যের; বেলের পকেটের পাঁচ ডলার নোটটিই ছিল তাঁদের সমগ্র মূলধন।

বেল তাঁর প্রথম বার্তা প্রেরণে যে যন্ত্রটা ব্যবহার করেছিলেন সেটা সত্যিই ছিল অপরিণত ও অসুবিধাজনক। এটা তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল যে পরবর্তী পর্যায়ে টেলিফোনের যে ব্যবহারিক প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র তাঁরা নির্মাণ করবেন সেগুলিকে সুবিন্যস্ত, আঁটসাট ও সহজে বহনযোগ্য করতে হবে যাতে যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট আফিসে গ্রহণযোগ্য হয় সেগুলি।

বাগ্‌যন্ত্রের সংস্থান বিষয়ক বক্তা ও শিক্ষক হিসেব তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল বলে তিনি পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে কয়েকটি কাজ পেলেন। তাঁর পারিশ্রমিক অল্পই ছিল বটে, কিন্তু কোন রকমে বেঁচে থাকবার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। ওরই থেকে তিনি ওয়াটসনকে টেলিফোনের সুগঠিত মডেল নির্মাণের জন্য কিছু ভাল উপকরণও কিনে দিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় বস্টনের একখানা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটি খবর লক্ষ্য করলেন তিনি। 'সিটি অফ প্যারিস' নামে একখানা জাহাজের আগমন সংবাদ সেটা। যাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন ক্লাইড তীরের এক জাহাজ-নির্মাতা, কে এক ম্যাকিন্‌টশ।

প্রায় দু'বছর আগে দুজনে একত্রে যে হোটেলে উঠেছিলেন, পরদিন খুব সকালে শ্রান্ত ও দুশ্চিন্তাপীড়িত বিজ্ঞানী সেই হোটেলে গিয়ে ম্যাকিন্‌টশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রীতিপূর্ণ কুশল প্রশ্নাদি

বিনিময়ের পরে জাহাজ-নির্মাতা বেলকে তাঁর কাজকর্মের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্ন করলেন মর্সে'র টেলিগ্রাফের কতটা উন্নতি-সাধন তিনি করতে পেরেছেন।

বেল তাঁর পুরাতন বন্ধুকে তাঁর শেষতম আবিষ্কারের সংবাদ—তিনি যে তারের মধ্যে দিয়ে মানুষের কথা টেলিগ্রাফ করতে সক্ষম হয়েছেন, তা জানালেন।

'তুমি কি বলতে চাও তুমি সত্যি বহু মাইল দূরবর্তী কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারো?'

'ঠিক তাই বলছি আমি,' বেল সঙ্গে সঙ্গে এত অকপট স্বরে জবাব দিলেন যে বিচক্ষণ স্কটস্‌ম্যান অংশত হলেও তাঁকে বিশ্বাস করলেন।

'তুমি তোমার এই আবিষ্কার দিয়ে কি করতে চাও!'

'বর্তমানে কিছুই নয়', বেল আমতা আমতা করে বললেন, 'দেখুন, আমার টাকাপয়সা একদম ফুরিয়ে গেছে। আসলে আমি এখন কপর্দকহীন। সম্ভবত আপনার মনে থাকতে পারে আপনি আমার প্রয়োজন হলে টাকাপয়সার দিক থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারেন, বলেছিলেন। আপনি তো জানেন, পরিচ্ছন্ন সুগঠিত একটি মডেল তৈরী করতে বেশ টাকার প্রয়োজন, আর আজকাল পেটেন্টের এটর্নিরাও প্রচুর টাকা দাবী করে।'

'ঠিক তাই। তোমার কত প্রয়োজন হবে বলে তুমি মনে করো?'

'আমরা মনে হয় তিনশ ডলারের মত হলেই আমার চলবে।'

ম্যাকিন্‌টশ চিন্তান্বিতভাবে তাঁর গোঁফে তা দিতে লাগলেন। বললেন, 'আমি যা করবো বলছি। আগামী কাল দশটায় সময় সণ্ডার্স এণ্ড হুবার্ডের (Saunders & Hubbard) আফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার মনে হয়, তোমার কাজ চলবার পক্ষে যথেষ্ট টাকা অগ্রিম দিতে আমি তাদের রাজী করাতে পারবো।'

পরদিন সণ্ডার্স এণ্ড হুবার্ড প্রতিষ্ঠান বেলের টেলিফোন মডেল তৈরী ও পেটেন্ট গ্রহণের আইনগত খরচার জন্য মূলধন অগ্রিম দিতে

স্বীকার করল। পরিবর্তে তারা বেলের যে কোন অথবা সব গবেষণার পেটেন্ট স্বত্বের অংশ পাবে বলে স্থিরীকৃত হল।

এক সপ্তাহ পরে ১৮৭৬ সনের ৭ই মার্চ তারিখে বেলকে জানানো হল যে তাঁর প্রথম পেটেন্ট অনুমোদিত হয়েছে। অবশ্য তাঁর আবিষ্কার থেকে আর্থিক লাভ কিছুই হল না। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ল যখন তাঁর পৃষ্ঠপোষকেরা জানাল যে তারা আর নগদ অগ্রিম দিতে পারবে না।

আবারও গবেষণা চালাবার মত টাকার অভাবে তিনি শুরু করলেন শিক্ষাদান, বক্তৃতা ও নতুন আবিষ্কৃত টেলিফোনের প্রদর্শনী। এই সব প্রদর্শনীতে দর্শক-সংখ্যা ভালই হ'ত, সংবাদপত্রেও খবর প্রকাশিত হ'ত। কিন্তু তবু টাকাপয়সা আসতো খুবই কম।

তারপর একদিন রাত্রিতে যখন ওয়াটসন আর তিনি তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলেন, বেল সহসা নীরব হয়ে গেলেন। চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি খানিকক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। সহসা সোজা হয়ে বসলেন তিনি। তারপর সেই শান্ত, ও প্রায় লাজুক বিজ্ঞানী তাঁর অগোছালো টেবিলের উপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করলেন ; চেঁচিয়ে বললেন, 'হয়েছে! আমাদের প্রয়োজন হল দেশজোড়া প্রচার! ঠিক তাই, আর কিছু নয়।'

এর পরে কিছুদিন নবীন প্রেরণায় উদ্দীপিত বেল তাঁর গবেষণাগারের কাজ ফেলে বিভিন্ন পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকের সঙ্গে সময় কাটাতে লাগলেন। দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদানে মৌখিক যোগাযোগই সংবাদ-সংগ্রহের সর্বাধুনিক পন্থা বলে তাদের বুঝাতে লাগলেন। তৎকালীন এক টেলিগ্রাফ কোম্পানির পরিচালকদের সঙ্গে বস্টন থেকে প্রায় পনর মাইল দূরে সালেম পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন ব্যবহারের সুবিধার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালাতে লাগলেন।

তাঁদের সংবাদ আদানক্ষেত্রে জবরদখলের সম্ভাবনা আশঙ্কা করে

অফিসারেরা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলেন। কয়েকদিন পরে কিন্তু তাঁরা মত পরিবর্তন করলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে বেলের এই নতুন উদ্ভাবিত কথা বলার যন্ত্র অত দূরে কার্যকর হবে না—বেলের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁরা সেটা প্রমাণিত করতে পারবেন। অনেক আলোচনার পর টেলিগ্রাফ কোম্পানি বস্টন থেকে সালেম পর্যন্ত একটি লাইন বেলের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হল।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতাসত্ত্বেও প্রচার কর্মী হিসেবে বেল বেশ সাফল্য লাভ করলেন। বস্টন ও আশেপাশের সংবাদপত্র এই বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর কাহিনী ছাড়িয়ে দিল—পনর মাইল দূরের মানুষের কাছে তারযোগে মানুষের মৌখিক বার্তা প্রেরিত হবে।

সেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার দিন বিকেলে পত্রিকার সংবাদদাতারা ও বিজ্ঞানীরা বস্টনে বেলের ল্যাবরেটরী ঘরে এসে জড় হল। বেলের গবেষণা-টেবিলে একটি গ্রাহকযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। একই সময়ে সালেমের এক পাবলিক হলে জড় হয়েছিল এক বৃহৎ শ্রোতৃদল—তাদের মনে সংশয়। স্টেজের মধ্যস্থলে একটি বেদীতে স্থাপিত হয়েছিল প্রেরকযন্ত্রটি। একটি কালো বাক্স সেটি—সেকালের বাক্স ক্যামেরার মত দেখতে আকারে একটু বড়। দুটি সরু তার বাক্সটি থেকে বেরিয়ে খোলা জানালার দিকে চলে গেছে। স্টেজের উপরেই একটি ইজেলে স্থাপিত হয়েছে একটি ব্ল্যাকবোর্ড। সান্ধ্য-পোশাকে সজ্জিত বেল সহজ ভাষায় টেলিফোনের মূলতত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে; প্রয়োজন মত ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দিলেন।

ওদিকে বস্টনে অভিজ্ঞ সাংবাদিকগণ ও সংশয়ী বিজ্ঞানীগণ বেলের কক্ষে বসে শুনলেন তার-পথে বেলের কথাগুলি সুস্পষ্ট ভেসে আসছে। তাঁদের সকলের মনোভাব নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়েছিল।

পরদিন সকালে ও পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে ধরে খবরের

কাগজগুলোতে এই অলৌকিক ঘটনার সংবাদ ও কাহিনী একটি বড় অংশ জুড়ে রইল। দূরদর্শী লোকেরা টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবসাক্ষেত্রে এর সম্ভাবনার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন। আবিষ্কারের পেটেন্ট লাভের চোদ্দ মাস পরে টেলিফোন ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে শুরু হল।

প্রথমদিকে বেল টেলিফোন কোম্পানি থেকে জোড়ায় জোড়ায় টেলিফোন ভাড়া দেওয়া হ'ত। যে লোক ভাড়া নিত সে নিজেই থাম পুঁতে তার বসিয়ে আত্মীয় বা বন্ধুর টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত করে নিত; হয়তো বাড়ী ও ব্যবসাস্থলের মধ্যে তার বসিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতো। সে অঞ্চলে অন্য যারা টেলিফোন ভাড়া নিত তাদের সঙ্গে কথোপকথন চালাবার কোন উপায় তার ছিল না।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে বিজ্ঞানের এই নতুন বিস্ময়ের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই এটাকে আরেকটি ধাপ্পা বলে মনে করলেন। যারা কোন বন্ধুর টেলিফোনে দূরস্থিত কোন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল, তারাও কথা বলতে গিয়ে যন্ত্রটি দেখে এত ভীত ও চমকিত হয়ে উঠল যে হয় তাদের কথাই বেরুল না, না হয়তো তারা চেঁচিয়ে সারা হয়ে গেল। সেকালে অনেকেই, বিশেষত নিউ ইংলণ্ডে, ফোন কথাটিকে ফোম বলতো।

কানেটিকাটের নিউ হ্যাভেন শহরেই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম বাণিজ্যিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ সনের জানুয়ারী মাসে সেখানে আটটি লাইন ও একুশটি গ্রাহককে যুক্ত করে একটি সুইচ বোর্ড স্থাপিত হল। প্রথম যুগের সেই সব দিনে, এবং তার পরেও বেশ কয়েক বছর অল্পবয়স্ক ছেলেদের টেলিফোন অপারেটার হিসেবে নিযুক্ত করা হ'ত।

পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে টেলিফোনের খ্যাতি দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ল। ক্লাবে ও গৃহে, আবাদে ও বাজারে টেলিফোন মানুষের

আলাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শীঘ্রই টেলিফোন স্থাপনের চাহিদা সম্ভাব্য সরবরাহের চেয়ে বেশী হয়ে পড়ল। বেল এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক সণ্ডার্স এণ্ড হুবার্ডের মধ্যে যে মৌখিক ব্যবস্থা ছিল সেটা একটা কোম্পানির রূপ ধারণ করল। বেল তাঁর প্রতিজ্ঞানুযায়ী বিশ্বস্ত ওয়াটসনকেও পেটেণ্টের একজন মালিক হিসেবে কোম্পানিতে গ্রহণের জন্য জেদ করতে লাগলেন।

এরই ফলে যে অংশীদারি আরম্ভ হল তা বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তর সংবাদ আদান-প্রদান প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। বেল পেটেণ্টের মালিক আমেরিকান বেল টেলিফোন কোম্পানি হল দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানি অন্যান্য স্থানীয় কোম্পানিগুলিকে লাইসেন্স্ প্রদান করতো; সেই লাইসেন্সের বলে তারা গ্রাহকদের টেলিফোন ভাড়া দিত। এই সব কোম্পানি যেমন সংখ্যায় বেড়ে চলল তেমনি স্বপ্নাতীত উন্নতিও লাভ করল। কিন্তু তারা যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল ততই লাইনের অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, তাদের আর্থিক কাঠামো শিথিল হয়ে পড়ল। তার ফলে এক দিকে দেখা দিয়েছিল অপচয় ও বিশৃঙ্খলা; অন্যদিকে গ্রাহকেরাও কাজ পেতো অতি নিম্নস্তরের।

এই সময়ে নিয়ন্ত্রণ ও সংযোগরক্ষার জন্য সৃষ্ট হল আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানি। এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি-গুলি বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতো। সংক্ষেপে একে বলা হয় 'বেল-তন্ত্র'; এতে বর্তমানে আছে :

(১) পৃথিবীর বৃহত্তম কারিগরী লেবরেটরী। যোগাযোগ ক্ষেত্রে নানাবিধ গবেষণার কাজে বেল টেলিফোন লেবরেটরীজ আত্মনিয়োগ করেছে।

(২) বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মে নিযুক্ত কতকগুলি টেলিফোন কোম্পানি।

(৩) ওয়েস্টার্ণ ইলেকট্রিক কোম্পানি নামে একটি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান; এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র তন্ত্রের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে অথবা ক্রয় করে।

(৪) সমগ্র তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। অধিকাংশ কোম্পানির অধিকাংশ স্টক A. T. & T.-এর হাতে। অধীন কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করবার সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এই সংস্থা কাজ করে। এই সংস্থার Long Lines Department থেকে এরা বহু দূরবর্তী টেলিফোন ব্যবস্থাও চালনা করে।

বর্তমানে সমগ্র আমেরিকা জোড়া টেলিফোন ব্যবস্থায় চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টেলিফোন পরস্পর সংযুক্ত, তাদের অধিকাংশই 'বেল তন্ত্রের' অধীন। বাকী সব টেলিফোন চালিত হয় প্রায় ৫,৫০০ টেলিফোন কোম্পানি দ্বারা। পল্লী অঞ্চলের টেলিফোন ব্যবস্থা পরিচালনা করে ৬০ হাজারেরও বেশী ছোটখাটো কোম্পানি। কিন্তু এ সব লাইনেরই বেলতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ রয়েছে; ফলে আইওয়ার এক গ্রাম্যচাষীও বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য বা ব্যবসার কাজকর্মের জন্য চার কোটি চল্লিশ লক্ষ টেলিফোনের যে কোন লাইনে কথা বলতে পারে।

আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল যদিও তাঁর আবিষ্কারকে প্রাথমিক পর্যায়ের চেয়ে উন্নত করার আর চেষ্টা করেননি তবু তাঁর আবিষ্কারের চূড়ান্ত উন্নতি হলে সামগ্রিক সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থারও যে উন্নতি হবে তার পূর্ণরূপ তিনি তখনই অনুধাবন করেছিলেন। ১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে লণ্ডনের একদল পুঁজিপতিদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, 'টেলিফোন তারের কেবল্ মাটির নীচে বা উপরে ঝুলিয়ে স্থাপন করা সম্ভব বলে ধারণা করা যায়; ঐ তার থেকে শাখা-তার স্থাপন করে বাসগৃহ, গ্রামের বাড়ী, দোকান, কারখানা প্রভৃতিকে সংযুক্ত করে হয়তো কেন্দ্রীয় কোন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে। তারপর ঐ তার ইচ্ছামত শহরের যে কোন দুটি স্থানের মধ্যে সোজাসুজি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্ত করে দেওয়া যাবে।'

মানুষের কণ্ঠস্বর তার-পথে পরিচালিত করার মত যন্ত্র নির্মাণে বেল সচেষ্ট ছিলেন বলে মানুষের ধারণা; কিন্তু আসলে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির প্রায় সবটাই তিনি নিয়োজিত রেখেছিলেন তাঁর ঐকতানিক টেলিগ্রাফের কাজে, টেলিফোনের কাজে নয়। তাঁর আর্থিক পৃষ্ঠ-পোষক সণ্ডার্স এণ্ড হুবার্ডের মনোভাবই এজন্য মুখ্যত দায়ী; তাঁরা টেলিফোনকে বিজ্ঞানীর অবাস্তব স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এর জন্য মূলধন বিনিয়োগের গুরুতর ঝুঁকি নিতে তাঁরা রাজী ছিলেন না। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ তখন ব্যবসা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত; তার একমাত্র অসুবিধা হল টেলিগ্রাফ তারের;—তারে একবারে একটির বেশী বার্তা বাহিত হতে পারতো না। একই তারের মধ্য দিয়ে কোন যন্ত্র দিয়ে যদি একসঙ্গে কয়েকটি করে বার্তা প্রেরণ করা যায় তবে

সে যন্ত্র যে টেলিগ্রাফ কোম্পানিগুলি লুফে নেবে তা বুঝবার জন্য খুব বেশী ব্যবসা-বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না।

বেলের অংশীদারের কাছে টেলিফোন এত তুচ্ছ মনে হয়েছিল যে পেটেন্ট স্বত্ব নিয়ে যে চুক্তি করা হয়, তাতে শুধু ঐকতানিক টেলিগ্রাফের উল্লেখ ছিল, টেলিফোনের উল্লেখও ছিল না। পরে যখন তিনজন অংশীদার মিলে বেল পেটেন্ট এসোসিয়েশন রেজিস্ট্রি করেন তখন বেলের সদাচরণের নীতির ফলেই টেলিফোনও চুক্তির অঙ্গীভূত হয়। সে সময়ে টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল একান্ত অপরিণত, অনেক ত্রুটি তার। একে মজার জিনিস বলে মনে করা হ'ত, ব্যবসার জিনিস নয়। বেল কিন্তু এর মধ্যে বিরাট শিল্পের জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন; তাই তিনি অন্তত সীমাবদ্ধ আকারে এর উন্নতির চেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অংশীদার সণ্ডার্স ও হুবার্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন—একজন যথেষ্ট নিপুণতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবহারিক কারিগর তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং এই আবিষ্কারকে বেলের পরিচালনাধীনে আর্থিক দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করবেন।

বেলের গবেষণা-সহকারী টমাস এ. ওয়াটসনের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। শর্ত হল ওয়াটসন প্রথমে তাঁর অর্ধেক সময় এবং পরে সমগ্র সময় এই সংশয়জনক আবিষ্কারের পিছনে ব্যয় করবেন। এর পরিবর্তে ওয়াটসন দৈনিক ৩ ডলার বেতন হিসাবে পাবেন, এবং পেটেন্টের আয়ের এক দশমাংশ পাবেন। ঐ চুক্তির ফলে আধুনিক বেল লেবরেটরীর সূত্রপাত হল। বর্তমানে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার—এতে প্রায় ৭০০০ হাজার বৈজ্ঞানিক ও কারিগর কর্মে নিযুক্ত আছেন। এই লেবরেটরী থেকেই বেলের সেই আদিম টেলিফোনের যে অলৌকিক উন্নতি হয়েছে তার ফলে টেলিফোন আজ পৃথিবীর ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে। টেলিফোন না থাকলে পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গে একশ বছর পিছিয়ে যাবে।

বেলের টেলিফোন পেটেন্ট যদিও ১৮৭৬ সনে প্রদত্ত হয়েছিল তবু

আমেরিকানরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে টেলিফোন ব্যবহার করতে শুরু করে কয়েক বছর পরে। ১৮৮০ পর্যন্তও সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটিও সুইচ্ বোর্ড ছিল না। বস্টনে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ই. টি. হোমসের দালালীর আপিসে এই ক্ষুদ্রাকার বোর্ডটি স্থাপিত হয়েছিল। চারটি ব্যাঙ্ক ও একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে পরস্পর সংযুক্ত করেছিল এই সুইচ্ বোর্ড। রাত্রিতে যে সব লাইন চুরি ডাকাতি হলে টেলিগ্রাফ সঙ্কেতের জন্য ব্যবহৃত হ'ত, দিনের বেলা সেই সব তার টেলিফোনের জন্য কাজে লাগানো হয়েছিল।

পরবর্তী কয়েক বছরে টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ যথেষ্ট সম্প্রসারিত হল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বস্টন থেকে রোড দ্বীপের প্রভিডেন্স্ পর্যন্ত লাইন খোলা হল তখন সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তিন বছর পরে নিউইয়র্কে বসে ২৩৫ মাইল দূরে বস্টনের কোন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব হল। অল্প সময়ের মধ্যেই বস্টন ও নিউইয়র্ক আলাপ করতে শুরু করল শিকাগো, মিলওয়াকি, পিট্স্বার্গ ও ওয়াশিংটন, ডি. সি. র সঙ্গে। ১৮৯২ সনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক মানুষ একে অন্যের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ পেয়ে গেল।

ইতোমধ্যেই সারা দেশ জুড়ে সব পরস্পর বিচ্ছিন্ন টেলিফোন কোম্পানি গজিয়ে উঠছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল ছোট ছোট, তাদের কার্যকলাপ নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—দীর্ঘদূর টেলিফোনের ব্যবস্থা ও সুযোগ তারা দিতে পারতো না।

এর পরে ধীরে ধীরে দু'টি তিনটি করে কোম্পানি একত্রে সম্মিলিত হয়ে ব্যবসা চালাতে শুরু করল। বিড়ালশিশু সূতো নিয়ে খেলা করলে যেমন তা জড়িয়ে যায় তেমনি জটিল হয়ে পড়ল এর পরে টেলিফোন কোম্পানির জাল।

তখনও কোন জাতীয় টেলিফোন সার্ভিস গড়ে ওঠেনি। ১৮৮৫ সনে আমেরিকান টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানি স্থাপনের

ফলে এই পথে এক ধাপ অগ্রগতি ঘটে। দীর্ঘদূর টেলিফোন ব্যবস্থা, আঞ্চলিক কোম্পানিগুলিকে পরস্পর যুক্ত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র টেলিফোন ব্যবহারকারীদের নাগালের মধ্যে টেলিফোন পৌঁছে দেওয়া—এই সব উদ্দেশ্যেই এই কোম্পানি গঠিত হয়েছিল।

এর পরেই শুরু হয় সেই পরিকল্পনার কাজ, মানুষের সব বৃহত্তম পরিকল্পনার মধ্যে যেটি অন্যতম : যোগাযোগ ব্যবস্থার সাম্রাজ্য গঠন। দীর্ঘ লাইনগুলি ক্রমশ বর্ধিত হয়ে চলল। অনুসন্ধান ও জরিপের জন্য বহু টাকা ব্যয় হতে লাগল। যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও কর্মপদ্ধতি উন্নয়নের জন্য দিবারাত্রি চলল গবেষণা। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা হল, যাতে সকলে সস্তায় উন্নত ধরনের টেলিফোন পেতে পারে।

এরূপ বিরাট উদ্যমের জন্য যে কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছিল সেই অপব্যয়ে অনেকেই তখন দুঃখিত হয়েছে। অনেকেই একে মনে করেছে তখন বিপজ্জনক জুয়াখেলা। যে অল্প কয়েকজন সংবাদদাতা বেলের চিলেকোঠার লেবরেটরীতে উপস্থিত হয়ে পনের মাইল দূর হতে তাঁর কথা শুনেছিল, তারা মানুষের মনের উপর টেলিফোন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা ধরতে পারেনি। অবশ্য তাদের কেউ কেউ ইতোমধ্যেই টেলিফোনে স্কুপ সংবাদ পত্রিকা আপিসে প্রেরণ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কয়েকজন সম্পাদকও সামগ্রিক সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে টেলিফোনের উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা এটাকে মনে করেছিলেন এক নতুন খেয়াল বলে ; ভেবেছিলেন অন্যান্য খেয়ালের মত টেলি-ফোনও এক সময়ে তার নতুনত্বের মোহ হারিয়ে ফেলবে। তাই ব্যবসায়ীদিগকে তাঁরা সতর্কভাবে অগ্রসর হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সে পরামর্শ একেবারে অকারণেও ছিল না। কারণ সেকালে টেলিফোন ব্যবহার করা, বিশেষত যে সব ভীতু ধরনের লোকের তড়িতের ভয় ছিল তাদের পক্ষে, ছিল গুরুতর পরীক্ষার মত। যে ধরনের যন্ত্র তখন ব্যবহার করা হ'ত তা 'দেওয়াল ফোন' নামে

পরিচিত ছিল। জিনিসটা ছিল বাক্সের মত দেখতে, এককোণে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত ওটা। সেকালের ফোন ব্যবহারের পরীক্ষার কথা এক অতি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন নিউইয়র্কের এক বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি ছেলেবেলায় পিতাকে বহুবার টেলিফোন করতে দেখেছেন।

টেলিফোন করতে গেলে প্রথমে একটি বাঁকা হাতল ধরে জোরে কয়েকবার ঘুরিয়ে দিয়ে 'কেন্দ্র' থেকে উত্তরের জন্য বসে থাকতে হ'ত। উত্তর না এলে বারে বারে সেই হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেঁচামেচি করে ডাকাডাকি করতে হ'ত 'হ্যালো, সেন্ট্রাল! হ্যালো সেন্ট্রাল!' শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের মধ্যে এক খড়্‌খড়্‌ ঝন্‌ঝন্ শব্দ উত্থিত হ'ত; শোনা যেত কম্পিত গুঞ্জন, তারপর অল্পবয়স্ক বালক অপারেটরের কণ্ঠস্বর 'নম্বর বলু-ন!'

নম্বর দিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে, মাঝে মাঝে পা বদল করে, আর বারে বারে 'হ্যালো' বলতে বলতে টেলিফোনকারীকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রে ঘড়্‌ ঘড়্‌ ধ্বনি এবং তারের অপর প্রান্ত থেকে অস্পষ্ট 'হ্যালো' শোনা যেত। তারপর চলতো আলাপ, কিন্তু মাঝে মাঝেই কথা থামিয়ে চীৎকার করতে হ'ত, 'একটু জোরে বলুন, শুনতে পাচ্ছি না।' এমনি করে কাটতো বেশ কয়েকটি উত্তেজনাপূর্ণ মিনিট। হাতলের ঝন্‌ঝন্ শব্দের সঙ্গে যখন 'ডাক' শেষ হয়ে যেত, টেলিফোনকারীর মুখে ফুটে উঠতো বিজয়ের হাসি।

এর পরে যখন দীর্ঘ লাইন স্থাপিত হল, দূরের মানুষের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা ছিল এক এ্যাডভেঞ্চার বিশেষ। অনবরত উন্নতি সত্ত্বেও তখনও টেলিফোনের ব্যাপারে বিরক্তি কম ছিল না। 'সেন্ট্রাল'কে ডাকার পরীক্ষা যখন শেষ হ'ত এবং যার সঙ্গে টেলিফোনকারী কথা বলতে চায়, তার নাম, ঠিকানা ও নম্বর দেওয়া হ'ত, তখন তাকে ফোনটি ঝুলিয়ে রাখতে বলা হ'ত। তাকে একথাও জানিয়ে দেওয়া হ'ত যে অন্যপক্ষকে টেলিফোনে পেতে পনর বা বিশ মিনিট

বিলম্ব হবে। দূরত্ব যদি একশ মাইলের বেশী হ'ত তবে যাদের জোর গলা ও সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি থাকতো তারাই সুস্পষ্টভাবে আলাপ চালাতে পারতো।

এই গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের পোর্ট ওয়াশিংটনে আমি ডেস্কের ফোনটি তুলে নিয়ে নিতান্ত খেয়ালবশেই ক্যালিফোর্ণিয়াতে আমার মেয়েকে ডাকলাম। অপারেটরও তেমনি একটু ব্যস্ত না হয়ে নম্বরটা নিল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল, তারপরই শুনতে পেলাম সুস্পষ্ট, কোমল, কম্পিত, প্রিয় কণ্ঠস্বর—যেন একই কক্ষে বসে কথা বলছি দুজনে।

দুজনে কথা বলতে বলতে সহসা অদ্ভুতভাবে মনে পড়ল অতীতের এক ঘটনা। আমারই জীবনের অনেক আগেকার দিনের কথা, আমি তখন একেবারে কচি সংবাদদাতা। নিউ জারসির প্যাটারসনে হঠাৎ এক চমকপ্রদ সংবাদ পেলাম। এক কাপড়ের মিলের কোষাধ্যক্ষ বহু টাকা নিয়ে হঠাৎ সরে পড়েছে। চমৎকার মানুষ, অথচ ঘোড়-দৌড়ের নেশায় মেতে লোকটা ডুবে গেছে—তারই কেলেঙ্কারীর কাহিনী।

কাছেই এক সিগারেটের দোকানে একটি সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য ফোন ছিল। দৌড়ে গেলাম সেখানে। গোপনতা রক্ষা করবার জন্য আমি পত্রিকা আপিসের সঙ্গে বেশ সংযত কণ্ঠে কথাবার্তা বললাম। ফোনে নানারকমের গুঞ্জন উঠতে লাগল। আরও মুশকিল হল এই জন্য যে, যে বার্তা সম্পাদককে আমার কাহিনী বলছিলাম সে যে কেবল অত্যন্ত শ্রান্তই ছিল, তা নয়, একেবারে শেষ সময়ে, কাগজ মেসিনে উঠবার আগটাতে বলে সে নার্ভাসও হয়ে পড়েছিল।

পরদিন সকালে আপিসে পৌঁছে আমি যে সংস্করণে আমার সংবাদটি ছিল তার এক কপি তুলে নিলাম। আশা করেছিলাম সংবাদটি প্রথম পাতায় তিন কলম শিরোনামা নিয়ে বেরুবে। তার বদলে সংবাদটি এগারর পাতায় বিজ্ঞাপনের ভিড়ে লুকানো অবস্থায় বেরিয়েছে। তারিখ, নাম, টাকার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য

হয় ভুল, নয়তো বানান ভুলে ভরা। কৈফিয়ৎ হল 'ফোনের যোগাযোগে ত্রুটি'।

কয়েক বছর আগে আমাদের এক বন্ধুর চারিটি টেলিফোনের সঙ্গে ভাগে একটি লাইন ছিল। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় প্রায় আটটার সময় সম্পূর্ণ লাইন অকেজো হয়ে পড়তো এবং প্রায় এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ঐ অবস্থায় থাকতো। টেলিফোন কোম্পানি থেকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেও কোন গোলমাল বের করতে পারল না। কয়েক মাস ধরে কোম্পানির সেরা কারিগরেরা লাইনের ত্রুটি বের করতে হিমসিম খেয়ে গেল, কিন্তু ফল কিছু হল না। প্রতিবারই একই সময়ে ব্যাপারটা ঘটতো।

শেষে একদিন সন্ধ্যায় বন্ধু দেখতে পেলেন পাশের বাড়ীতে ঠাকুমার মত এক বৃদ্ধা মহিলা একটি খোলা জানালার পাশে বসে আছে। সে বাড়ীর সবার মোজা-টোজা সেলাই করছে বসে বসে। সহসা ফোন অকেজো হওয়ার সমস্যাটা মিটে গেল। ভাগের লাইনে একটা ফোন ওদেরও। বুড়ী কিন্তু না জেনে ফোনটাকে লাইনের চাক হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সে জানতো না, পার্টি লাইনের একটি ফোন তুলে নিলে কেন্দ্রীয় স্টেশন থেকে অন্য ফোনগুলো কেটে দেয়।

হাজার হাজার লোকের জীবিত কালেই টেলিফোনের যে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটেছে তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ১৯০৪ সনে বর্তমানে ডকমাস্টার 'জাম' স্মিথ নিউইয়র্ক নগরী থেকে বিশ মাইলেরও কম দূরে পোর্ট ওয়াশিংটনের বেইলিস ফার্মেসীর কেরানী ছিল। সেই সময়ে গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ২০০০-এর কম, এবং তা নিয়ে তাদের বেশ গর্বও ছিল।

গ্রামের ঔষধ বিক্রেতা হলেও ডাঃ বেইলিস খুব সজাগ ব্যবসায়ী ছিলেন। ঔষধের ব্যবসার সঙ্গে তিনি বুট এবং জুতোর ব্যবসাও চালাতেন। তাঁর দোকানে ছিল গ্রামের সকলের আড্ডা। দোকানের বাড়তি

আকর্ষণ হিসেবে তিনি একটি টেলিফোন রাখবেন স্থির করলেন। চারিদিকে বহু মাইলের মধ্যে একটিও টেলিফোন ছিল না ; নিউইয়র্কের চেয়ে কাছে অল্প দু'চারটে মাত্র ছিল।

গ্রামের অধিবাসীরা এই নতুন 'কথা-বলা বাক্স' দেখতে ভিড় জমাতো—এ বাক্স বহুদূরে মানুষের কণ্ঠস্বর বহন করে নিয়ে যায়। অনেকে সাহস সঞ্চয় করে ঐ বৃহৎ শহরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে টেলিফোন করতো। এই টেলিফোন করার সময়ে অন্য ক্রেতারা বিস্ময়ে হাঁ করে টেলিফোনকারীর চারিপাশে জড়ো হ'ত। তারা প্রত্যেক কথা যেন গিলতো ; অনেক সময় সংশয় ও অবিশ্বাসের সঙ্গে তারা মাথা ঝাঁকাতে থাকতো।

কিছুদিনের মধ্যেই নিউইয়র্কের লোক ড্রাগ স্টোরে টেলিফোন করে খবর পাঠাতো—পোর্ট ওয়াশিংটনে তাদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিলি করবার জন্য। স্টোরের কেরানী স্মিথের কাজ ছিল সে বার্তা লিখে নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে ঠিক লোককে খবরটা পেঁাছে দেওয়া।

এর জন্য অনেক সময় পাঁচ থেকে দশ মাইল পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে তাকে দৌড়াতে হ'ত। গ্রীষ্মকালের দোকানের একঘেয়েমি যখন অসহ্য মনে হ'ত তখন অবশ্য এ রকম বাইরে বেড়ানোটা বেশ প্রীতিপ্রদই ছিল। শীতকালে কিন্তু এটা ছিল কঠোর পরীক্ষার মত। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীতে নেমে আসতো, বরফ ঝড় বইতে থাকতো গ্রামাঞ্চলে—প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে অগ্রসর হতে হ'ত স্মিথকে তার ঘোড়া নিয়ে।

একদিন তীব্র শীতের রাতে তুষারঝড়ে তার গাড়ী উল্টে গেল, ভীত ঘোড়া গেল পালিয়ে। বাড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে অন্ধকারে তুষারের মধ্যে আটকা পড়ে রইল স্মিথ। ঘোড়াটা অনুতপ্ত হয়েই যেন বহুক্ষণ পরে ফিরে এল ; স্মিথ গদী ছাড়া ঘোড়া চড়েই টেলিফোনের খবর পেঁাছে দিতে গেল। বহু কষ্টে বাড়ীটি খুঁজে বার

করে সে দরজায় আঘাত করল। ড্রেসিং গাউন ও আটপৌরে টুপি পরা এক মহিলা বেরিয়ে এসে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল 'কী চাও তুমি?' শীতে আধা জমাট ধরা কেরানী টেলিফোনের খবর লেখা কাগজখানা তার হাতে তুলে দিল; হয়তো আশা ছিল গতানুগতিক ধন্যবাদ এবং অল্প কিছু পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে। মহিলাটি পেন্সিলে লেখা সংবাদটি বার দুই পড়ে বাহকের হাতে ফেরত দিল। বলল, 'ও আমি চাই না, তুমিই নিয়ে যাও।'

ডক্‌মাস্টার স্মিথ টেলিফোনের উন্নতি ও প্রসারের বিষয় বর্ণনা করে চললেন। স্থানীয় এক চিকিৎসক ঔষধের দোকানের সঙ্গে সহজে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য একটি টেলিফোন নিয়েছিল। তার একজন রোগী ডাক্তার ডাকবার সুবিধার জন্য নিয়েছিল টেলিফোন। রোগীটির এক বান্ধবী একটি ধনী মহিলাও নিয়েছিল একটি ফোন, গল্পগুজব করবার জন্য শুধু। ঔষধের দোকানটি থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে বাস করতেন কংগ্রেসের এক সভ্য, বিখ্যাত বক্তা। তিনি মাঝে মাঝেই দোকানে আসতেন, তাঁর নিউইয়র্ক আপিসে সেক্রেটারীর কাছে চিঠিপত্র ও বক্তৃতার নোট দিতেন ফোনে। পরে তিনিও তাঁর বাড়ীতে একটি ফোন নেন। এক বছরের মধ্যে গ্রামে তেরটি ফোন আনা হয়েছিল, কিন্তু এগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের কোন সুবিধা ছিল না।

ড্রাগ স্টোরে একটি সুইচ্‌ বোর্ড স্থাপিত হয়। বোর্ডে কোন জটিলতা ছিল না; এর আকারও রুটির বাক্সের চেয়ে বেশী বড় ছিল না। এতে তেরটা চাবি বা সুইচ্‌ বসানো ছিল। দোকানের কেরানী স্মিথ হল ও অঞ্চলের প্রথম টেলিফোন অপারেটর।

শীঘ্রই টেলিফোনের রহস্য অনেকটা ফিকে হয়ে এল। এর নানাবিধ সুবিধা লোকের আলাপ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। টেলিফোন কোম্পানিতে অনবরত টেলিফোন বসাবার দরখাস্ত পড়তে লাগল। ড্রাগ স্টোরের সুইচ্‌ বোর্ড বারে বারে বাড়ানো হল;

শেষ পর্যন্ত দোকানের কেরানীর পক্ষে আর একা এত টেলিফোনের কাজ চালানো সম্ভব হল না। মেইন স্ট্রীটের এক বাড়ীর তেতলায় একটি কেন্দ্রীয় আপিস খোলা হল এবং দুজন তরুণী অপারেটর নিযুক্ত হল। এক সময়ে যে অঞ্চলে তেরটি ফোনের একটি সুইচ্ বোর্ড ছিল, বর্তমানে সেই অঞ্চলে প্রায় ১০,০০০ টেলিফোন চালু হয়েছে।

বহু চাবিযুক্ত যে সুইচ্ বোর্ড বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক পরম বিস্ময়। প্রত্যেক গ্রাহকের লাইনই বোর্ডে এসে শেষ হয়। সেখানে ঐ একটি লাইন থেকে বিশটি পর্যন্ত শাখালাইন বার করা হয়; ফলে অপারেটরের ২,০০,০০০টি সংযোগ বিন্দু ব্যবহারের সুযোগ থাকে। তাই কেউ ডাকা মাত্রই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

বড় আকারের বহু চাবিযুক্ত সুইচ্ বোর্ড হাজার হাজার স্বতন্ত্র অংশের সমবায়ে নির্মিত; এর কারিগরির সঙ্গে ভাল ঘড়ির নানা অংশের কারিগরির তুলনা চলে। এতে কুড়ি লক্ষের বেশী ঝালাই সংযোগ থাকতে পারে, প্রত্যেকটি অংশ একটি পিনের মাথার চেয়ে হয়তো বড় নয়। এর সাঙ্কেতিক বৈদ্যুতিক আলোর সংখ্যা ১৫,০০০ এরও বেশী, আর এতে যে তার ব্যবহৃত হয় তার দৈর্ঘ্য অন্তত ৪,০০০ মাইল—সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

টেলিফোনের উন্নতির ক্ষেত্রে ডায়াল ফোনের ব্যবহার উন্নতির একটি বৃহৎ ধাপ। এতে যে শুধু টেলিফোন তরান্বিত হয় তা নয়, অনেক বেশী নির্ভুলও হয়, কারণ এতে মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য ভুলের কোন সুযোগই নেই। এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই এতে যে জটিল প্রক্রিয়া সাধিত হয় সেটা পূর্বে অপারেটরের নিপুণতা এবং অনেক-ক্ষেত্রে তার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করতো।

ডায়াল টেলিফোন ব্যবস্থা যেখানে চালু হয়েছে সেখানেও সুকণ্ঠী তরুণীদের কাজ থাকে। তাদের টোল কল (toll) নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, বহুদূরের টেলিফোন কলের ব্যবস্থা করতে হয়, আবার যাদের

নম্বর ডাইরেক্টরীতে তালিকাভুক্ত হয়নি তাদের নম্বর দিতে হয়। এছাড়া যে যা সাহায্য চায় তাকে সেই সাহায্য দেওয়া তাদের কাজ। জরুরী অবস্থায় পুলিস বা অগ্নিনির্বাপককে খবরও দেয় তারা।

সাধারণত প্রতিদিনের টেলিফোন কলের সংখ্যা জোয়ার ভাঁটার নিয়মে ওঠানামা করে। প্রত্যেক বড় শহরে সকাল ৯ টা থকে ১১ টার মধ্যে টেলিফোন কলের সংখ্যা হয় সর্বোচ্চ। মধ্যাহ্নে ভোজনের সময়ও সংখ্যাটা বেশ বাড়ে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পড়েও যায়। এর পর আবার কল বাড়ে ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে। এই সব সংখ্যাবৃদ্ধির সময়ে ডায়াল টেলিফোন ব্যবস্থাতেও প্রাণচাঞ্চল্য জাগে। এর পরিচালন-ব্যবস্থা এত জটিল যে সাধারণ লোকের পক্ষে তা অনুধাবন করা কঠিন।

উদাহরণস্বরূপ যখন বৃহৎ শহরে কেউ ফোনের কোন নম্বর ডায়াল করে, তখন কেন্দ্রীয় আপিসে বৃহৎ যন্ত্রে প্রায় ২০০০ সুইচের সংযোগ ঘটে। গৃহে বা আপিসে যে ডায়াল টেলিফোন সেট ব্যবহার করা হয় তা দেখতে অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু সেই বাহ্যত সরল যন্ত্রটির মধ্যে অন্তত ৪৩৩টি পৃথক পৃথক অংশ রয়েছে। এই সব অংশের কোন কোনটি এত ক্ষুদ্র যে, ম্যাগনিফাইং কাচ ব্যবহার না করে তাদের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা চলে না। টেলিফোনের রাজত্বে যেদিকেই নজর দেওয়া যায়, দেখা মেলে নানা বিস্ময় ও রহস্যের। বেল নিজেও যদি বেঁচে থাকতেন তো এই সব রহস্যের সমাধান করতে হিমসিম খেয়ে যেতেন।

আগেকার দিনের এক তারের চেয়ে দুই তার ব্যবহারে যে ভাল ফল পাওয়া যায় সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে বেশী দিন নয়। আজকাল ছোট ছেলের কব্জির মত মোটা একটি কেব্‌লে ২০০০ হাজার তার থাকে; সেই তার-পথে ২০০০ টেলিফোন কল্‌ একসঙ্গে চলতে পারে।

বহু-তার কেবল্‌ প্রচলনের আগে অসংখ্য থাম, এবং থামের

মাথায় মাথায় তারের জটিল জালে সব শহরে নিবিড় বনের মত হয়ে গিয়েছিল।

নিউইয়র্কের অঞ্চল বিশেষে তারের জটিলতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে মনে হ'ত আক্রমণকারী রাক্ষুসে মাকড়সাবাহিনী যেন সমগ্র অঞ্চল জুড়ে জাল বুনে রেখেছে। এতে যে নগরপথ শুধু দেখতেই কুদৃশ্য হ'ত তা নয়, ঝুলানো তারের জঙ্গল বিপজ্জনকও ছিল। শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত ও ঝড়ে এই সব তারের মধ্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বেধে যেত। ঝড়ে মাঝে মাঝে তার ছিঁড়ে পথ আটকে যেত, যানবাহন চলাচল যেত বন্ধ হয়ে। টেলিফোনের উপরে নির্ভরশীল সব ব্যবসাই একদম বন্ধ হয়ে যেত। ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি উপরে তার স্থাপন করা আইন করে বন্ধ করে দিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন বহু-তার কেবল্ ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে গেছে মানুষ। মাটির নীচে শত শত মাইল স্থান জুড়ে কেবল্ স্থাপন করা হল; টেলিফোনের প্রসারক্ষেত্রে শুরু হল নতুন যুগ।

স্থানীয় যোগাযোগে ক্ষেত্রে একবার যখন টেলিফোন দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল, তখন দূরে দূরে অবস্থিত সব শহর থেকেও দাবি উঠতে লাগল বড় বড় সব বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য।

টেলিগ্রাফ যেমন ডট্‌ড্যাশ্ সাঙ্কেতিকের সাহায্যে বহুদূর স্থানেও বার্তা প্রেরণ করতে পারে, টেলিফোনের সে সুবিধা ছিল না। একশ মাইলের বেশী দূরে তার-পথে কথোপকথন ক্রমশ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে যেত; পরে আর বুঝাই যেত না। এ সমস্যা শুধু টেলিফোন ব্যবসারই নয়, বিজ্ঞানেরও সমস্যা হয়ে উঠল। বেল ল্যাবরেটরীতে বিজ্ঞানীরা, সহকারীরা ও কারিগরেরা অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে জ্বেলে বহুদূরে কথোপকথনযোগ্য টেলিফোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করতো। তাদের সাফল্যের প্রথম নাটকীয় প্রমাণ পাওয়া গেল যখন নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ার মধ্যে নব্বই মাইল পথে

টেলিফোন লাইন স্থাপিত হল। পৃথিবীর টেলিফোন ব্যবস্থার এটাই হল প্রথম পদক্ষেপ, এ. টি. এণ্ড টির দীর্ঘ-লাইন ব্যবস্থার সূচনা। শীঘ্রই বস্টন এবং বাফেলোর মত দূরবর্তী স্থানের মধ্যেও কথোপ-কথন চালানো সম্ভব হল। তিন বছর পরে নিউইয়র্ক ও শিকাগোর মধ্যে লাইন স্থাপিত হল ; এর দূরত্ব হাজার মাইল।

মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল ছাড়িয়ে টেলিফোন ব্যবস্থা প্রসারণের পূর্বে টেলিফোনের বহু উন্নতিবিধান প্রয়োজন হল। ১৯১১-র আগে নিউইয়র্ক ডেনভারের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। এরপর এল ১৯১৫-র সেই ঐতিহাসিক দিন, যখন প্রথম অন্তর্মহাদেশীয় লাইন প্রতিষ্ঠিত হল।

আলোকজাণ্ডার বেল তখন পৃথিবীবিখ্যাত। উপকূল থেকে উপকূল পর্যন্ত এই লাইনের উদ্বোধনে তিনি অংশ গ্রহণ করলেন। নিউইয়র্ক শহরের এক টেলিফোন থেকে তিনি সানফ্রান্সিস্কোতে তাঁর ভূতপূর্ব সহকারী টমাস এ. ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বললেন।

এই মহাদেশীয় লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৩৯০ মাইল ; এতে ১,৩০,০০০টি থামের প্রয়োজন হয়েছিল ; তেরটি রাষ্ট্রের উপর দিয়ে এই লাইন বসানো হয়। ছয় কোটি পাউণ্ড তামার তার ব্যবহৃত হয় এই লাইনে। এঞ্জিনিয়ারিং গঠনকর্মের এটি একটি বিরাট দৃষ্টান্ত। মালমশলা যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হয়েছে, পথের আইনগত স্বত্ব লাভ করতে হয়েছে ; দক্ষ কারিগরেরা ধীরে ধীরে সমতল, পর্বত, নদী ও মরুভূমির উপর দিয়ে লাইন বসিয়ে চলেছে। সেকালের এই সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়ে কত কষ্ট দুর্দশা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

১৯১২ সনের মধ্যেই 'বেল তন্ত্রের' কারিগরগণ দীর্ঘদূর টেলিফোন ব্যবস্থায় এম্‌প্লিফায়ার হিসেবে ডিফরেস্ট রেডিও ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করতে শুরু করে, এর উন্নতি-বিধানও করে। টেলিফোন শিল্পের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও সুস্পষ্টরূপে কথাবার্তা বলার পক্ষে দূরত্ব

তখনও বাধা হয়েই ছিল। ঐ ক্ষুদ্র যাদু টিউবটি দূরত্ব জয় করতে পারে—এই সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ লাইনে টেলিফোন করার সুবিধা হয়নি। টেলিফোন সার্কিটে প্রয়োজন মত দূরে দূরে এই রেডিও টিউবগুলি বসিয়ে দিলে এগুলি শব্দের শক্তি ও সুস্পষ্টতা বাড়িয়ে দিত। মহাদেশীয় লাইন সংস্থাপনের কয়েক মাস পরেই রেডিও টেলিফোনের প্রথম সফল পরীক্ষা হল। লং দ্বীপে মণ্টক পয়েণ্ট থেকে ডেলাওয়ারের উইলমিংটনে কথাবার্তা চালানো হল। সেই বহু ঘটনাপূর্ণ বছরেই টেলিফোন বার্তা সমুদ্রও লজ্ঘন করল রেডিওর সহায়তায়। ওয়াশিংটন ডি. সি-র সঙ্গে প্যারিসের বার্তা-বিনিময় হল।

১৯২৭ সনে প্রথম নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের মধ্যে একক সার্কিটে টেলিফোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। আজ যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন ব্যক্তি আটানব্বইটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের ও অঞ্চলের যে কোন লোকের সঙ্গে অথবা সমুদ্রের যে কোন জাহাজের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আজ এই সব সার্কিটের ১৪৪টি স্থায়ীভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দীর্ঘদূর টেলিফোনগুলি অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে বটে, কিন্তু আজও এর পূর্ণবিস্তার লাভ ঘটেনি। দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে টেলিফোন আলাপের সংখ্যা এখন বছরে ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ বার। দৈনিক দশ লক্ষটি কল একটি সাধারণ ঘটনা।

দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে আলাপের জন্য এখন চাহিদা প্রচুর। বেল তন্ত্রও বিজ্ঞানের সকল কোণা-ঘুপচি খুঁজে খুঁজে সেই সুবিধা আবিষ্কারে ব্যাপৃত।

পূর্বে, ধরা যাক নিউইয়র্ক ও সানফ্রান্সিস্কোর মধ্যে একটি টেলিফোন কল সম্ভাব্য বহু পথের একটি দিয়ে পরিচালিত হ'ত। কোন বিশেষ পথ ব্যাপৃত থাকলে অপারেটার অন্যান্য সব পথ এক এক করে খুঁজে দেখতো ; তারপরে হয়তো প্রশান্ত সাগরের উপকূলের সঙ্গে

যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হ'ত। যখন টেলিফোন ব্যবস্থা কর্মব্যস্ত থাকতো তখন এরূপ যোগাযোগ স্থাপনে বহু সময় নষ্ট হ'ত। বহু বৎসরের একাগ্র সাধনার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ 'ট্রানশ্লেটর' আবিষ্কার করলেন, মানুষ অপারেটরের যা শক্তির বাইরে, এই বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্র-মস্তিষ্ক তা মুহূর্তে সম্পাদন করে।

'ট্রান্‌শ্লেটর' দেশব্যাপী ডায়ালিং ব্যবস্থার নবতম সংযোগ-সূত্র। বহু লেন্‌স, ফটো-ট্র্যান্‌জিস্‌টর, আয়না, তীব্র আলোকরশ্মি এবং ছিদ্র-যুক্ত ধাতব কার্ড সমন্বিত অতি জটিল বিভ্রান্তিকর যান্ত্রিক ব্যবস্থা এটা। এর কাজ হল সবচেয়ে সোজা ও দ্রুত পথ বেছে বার করা। সার্কিট যদি কর্মব্যস্ত থাকে, তবে আপনা আপনিই এ চোখের পলকের মধ্যে বিকল্প পথ বেছে দেবে। ডায়ালিং ব্যবস্থায় একটিমাত্র পরিবর্তন করতে হয়—তিন অঙ্কের একটি সঙ্কেত-প্রয়োগ। দীর্ঘদূর টেলিফোন ব্যবস্থার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে নব্বইটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে; প্রত্যেক অঞ্চলের এক একটি তিন অঙ্কের সঙ্কেত-সংখ্যা রয়েছে।

ডায়াল করবার সময় সঙ্কেত-সংখ্যাটি স্থানীয় টেলিফোন নম্বরের আগে থাকে। ডায়াল থেমে যাবার আগেই কিন্তু অনেক ব্যাপার ঘটতে থাকে। বিশেষ ধরনের ছিদ্র-ছক যুক্ত একটি ধাতব কার্ড আলোকরশ্মির মুখে নেমে আসে। ছিদ্র-ছকের মধ্য দিয়ে যেসব রশ্মি চলে যায় সেগুলি ছাড়া সব আলোকের পথ আটকে যায়। অতি সূক্ষ্ম আলোকরশ্মিগুলি গিয়ে ফটো-ট্র্যান্‌জিস্‌টরে আঘাত করে; তার ফলে এক জটিল তার ও সুইচের রিলে-তন্ত্রের মধ্য দিয়ে ঐ ট্র্যান্‌জিস্‌টর বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত করে। ঐ রিলেগুলি একই সঙ্গে বিরাট যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সোজা পথটি খুঁজে বেড়াতে থাকে। অপারেটর 'ট্রানশ্লেটরের' মধ্যে সঙ্কেত-সংখ্যাটি ডায়াল করবার কয়েক সেকেণ্ড পরেই উদ্দিষ্ট স্থানের টেলিফোন বেলটি বেজে ওঠে।

এই রিলেগুলি মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত খাড়া সারিতে নির্মিত।

এর বিশেষ ধরনের যন্ত্রসজ্জা একান্ত জটিল ও মূল্যবান। এই সম্পূর্ণ পরিকল্পনা রূপায়িত করতে খরচ পড়েছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। এই খরচও খুব বেশী মনে হওয়ার কোন কারণ নেই, যেহেতু ট্যান্‌শ্লেটর নির্মাণ করতে চার বছর লাগে; বাড়ীর তিনটি তলা পুরোপুরি দখল করে আছে এই যন্ত্র; ২২,০০০ মাইল তামার তার এই যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়; আর এতে ১,৩০,০০০ সুইচ আছে, তাতে পাঁচ কোটি কানেকশন্‌ হাতে ঝালাই করে লাগানো হয়েছিল।

ট্যান্‌শ্লেটরটি বৃহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু টেলিফোন শিল্প পৃথিবীর বৃহত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকরী রাখবার জন্য কী পরিমাণ শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে এটা তার প্রমাণ। এর ফলে একজন সাধারণ মানুষও ডায়ালটি একবার ঘুরিয়ে তিন হাজার মাইল দূরবর্তী আরেক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ চালাতে পারে।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই তারের জাল ও বিদ্যুৎতরঙ্গ দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টা আয়ত্তে রাখবার জন্য কর্মীদের কী গুরুতর দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা এই শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না এলে অনুমান করা কঠিন। বন্যা, অগ্নি ও ঝঞ্ঝাবাত্যা যোগাযোগের সবচেয়ে বড় শত্রু; আবার আছে বরফ ও তুষার। টেলিফোনের ইতিহাসে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনবার প্রচণ্ড মারাত্মক ঝড় বিস্তৃত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনটি ঝড়ই হাজার হাজার টেলিফোন অকেজো করে দিয়েছিল, বহু কেন্দ্রীয় আপিস বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল, দীর্ঘদূর টেলিফোন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং যন্ত্রপাতিরও বহু ক্ষতি-সাধন করেছিল।

তুবার ঝড় উঠেছিল গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল থেকে। দক্ষিণ দিক থেকে দুর্দমবেগে এগিয়ে এসেছিল প্রচণ্ড ঝড়, সঙ্গে এসেছিল প্রবল জোয়ারের ঢেউ, বন্যা ও বৃষ্টি। বহু জায়গায় আগুন লেগেছিল। নিউইয়র্ক রাজ্যের উপকূল অঞ্চল, নিউইয়র্ক শহর আর রাজ্যের উত্তরাঞ্চল প্রকৃতির এই তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। হাজার হাজার

মানুষের প্রাণান্ত ঘটে, পঞ্চাশ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়; অপরদিকে নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে ৩০ লক্ষ বৃক্ষ ধ্বংস হয়েছিল সেই তুফানে। তৃতীয় ঝড়টি উঠেছিল একবার ডিসেম্বর মাসে, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে। এই তুষার ঝঞ্ঝার ফলে টেলিফোনের খুঁটি ও তারে এত বরফ জড়িয়ে গিয়েছিল যে তাতে হাজার হাজার খুঁটি ভেঙ্গে পড়ে এবং বহু জায়গায় উৎপাটিত গাছে তার জড়িয়ে যায়।

এই সব সঙ্কটসময়ে লাইনের মিস্ত্রি ও কারিগরদের ট্রাকে, রেলে বা প্লেনে করে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, চারিপাশের বহু-স্থান থেকে হাজার হাজার লোক এইভাবে এসে হাজির হয়।

১৯৪২ সনে এক সাংঘাতিক তুষার ঝটিকার সময়ে আমি প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের এমনি এক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছিলাম। উত্তাপ নেমে এসেছিল তুহিনাঙ্কে, ঝুর ঝুর করে তুষার পড়ে সব কিছু মোটা এক স্তর বরফের নিচে ঢেকে ফেলে দিয়েছিল। গাছের শাখা তুষারের ভারে ভেঙ্গে পড়ার মত হয়ে গেল; লতাগুল্ম ও চারাগাছের জঙ্গল মাটিতে সমান হয়ে বিছিয়ে পড়ল; সরু তারগুলিকে মনে হতে লাগল স্ফটিকের তারের মত; আর কেবল্‌গুলি বরফ জমে মানুষের বাহুর মত মোটা হয়ে গেল। প্রচণ্ড ভারে টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক তার ভেঙ্গে পড়তে লাগল। রাস্তায় লুটানো বৈদ্যুতিক তার থেকে আগুনের ঝলক বিচ্ছুরিত হয়ে নৈশ আকাশ উজ্জ্বল করে তুলতে লাগল। মোটা মোটা সব থাম ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কোন কোন স্থানে তুষারের ভারে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য তার জড়িয়ে জট পাকিয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোকে শত শত লোক তাদের বিভিন্ন কাজ করে চলল—তাদের ব্যস্ততা নেই, উত্তেজনা নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল এমনি জরুরী কার্যের জন্য বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীদল এরা। কারও গায়ে রবারের কালো কোট, কারও গায়ে চামড়ার পোশাক। শুভ্র স্ফটিকের পটভূমিকায় তারা কাজ করে চলল। বড়

বড় ট্রাকগুলো সার বেঁধে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল—বিরাট বিরাট কালো প্রেতমূর্তির মত। করাতের হিস্ হিস্ শব্দ, কুড়ালের ঠক্ ঠক্, মাঝে মাঝে ভারী জিনিস তুলবার যন্ত্রপাতির একটানা কর্কশ শব্দ, থামের উপর থেকে কর্মরত মানুষেরা নিচের লোকদের যে হুকুম দিচ্ছে তার তীক্ষ্ণ আওয়াজ, সব মিলিয়ে সে এক নাটকীয় দৃশ্য।

একটি ট্রাকের নিকটে দাঁড়িয়ে রবারের পোশাক পরিহিত একজন লোক চারিপাশের বিশৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করছিল। মাঝে মাঝে যুদ্ধের চাপের সময় সেনাপতির মতই নৈর্ব্যক্তিকভাবে সে কর্মীদের হুকুম করছিল। সে একজন ফোরম্যান, প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে অভিজ্ঞ যোদ্ধা। একটু ফাঁক দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুব কঠিন অবস্থা চলছে বুঝি?'

'আমি এর চেয়েও কঠিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি,' হাতের কাজ থেকে চোখ না তুলেই সে জবাব দিল।

'কতগুলি টেলিফোন অকেজো হয়ে গেছে?' প্রশ্ন করলাম।

'মনে হয় প্রায় দু'হাজার। কিন্তু সকালের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাকে মনে হল আমার আমাদের অভিজ্ঞ পারিবারিক চিকিৎসকের মত। এঁরা সাধারণত রোগী পরীক্ষা করে চলে যাবার সময় বলেন, 'এই ঔষধটা খাও। রাত্রে ভাল করে ঘুম দাও! সকালেই সুস্থ হয়ে যাবে।'

আমি যখন বাড়ী পেঁছিলাম তখন দুপুর রাত। বিদ্যুৎ সরবরাহ-ব্যবস্থা অচল হওয়ায় আমাদের গৃহের উত্তাপ-ব্যবস্থাও অকেজো হয়ে পড়েছে। টেলিফোনে ডেকে যে এই দুরবস্থার ব্যাপার জানাবো তাও বন্ধ। পরদিন দ্বিপ্রহরের আগেই কিন্তু একজন প্রতিবেশী আমাকে ফোন করলেন। আলাপের ফলে বুঝতে পারলাম যে তিনি গত রাত্রিতে যে ঝড়ে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে তা কিছুই জানেন না। তিনি যখন ঘুমুচ্ছিলেন তখন টেলিফোন কর্মচারীরা সারারাত টেলিফোন-ব্যবস্থা চালু করবার জন্য যে অমানুষিক সংগ্রাম করেছে তাও তাঁর অজ্ঞাত।

ছোট বড় সব টেলিফোন কোম্পানির ইতিহাসই এমনি সব বিপত্তির কাহিনীতে পূর্ণ। এই সব দুর্যোগের সময়ে যে সব নরনারীরা বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তারা থিয়োডোর এন. ভেইল মেডাল পুরস্কার পেয়েছে। ভেইল স্মারকনিধি প্রতিষ্ঠার পর আটাশ বছরে ১৩৬০টি পুরস্কার পুরুষ ও নারী কর্মীদের প্রদান করা হয়েছে। বন্যার সময়ে বন্যার জল যখন হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে তখনও নারী অপারেটরগণ সুইচবোর্ডে তাদের কাজ করে গেছে ধীরভাবে। এমনিভাবে যারা বিপদ অগ্রাহ্য করেও কর্তব্য করে গেছে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উদ্ধার পাওয়া ছিল কঠিন। পরে নৌকাযোগে বা অন্য কোন উপায়ে তারা উদ্ধার লাভ করেছে।

অস্বাভাবিক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যার ফলে যখন চারিপাশের সব দালান ভেঙ্গে পড়ছিল তখনও একবার চারজন অপারেটর সুইচবোর্ড পরিত্যাগ করেনি। সেই অবস্থাতেই প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি-সঞ্জাত বন্যা তাদের আক্রমণ করে। বৃষ্টি ও ঝটিকার দাপটে দালান কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তা সত্ত্বেও তারা চেয়ারে ও বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। শেষে যখন সুইচবোর্ডও ডুবে গেল তখন তারা সাঁতরে নিরাপদ স্থানে গিয়ে উঠেছিল।

সেবার যখন এক বাত্যাতাড়িত দাবাগ্নি মেইনে বার হারবার প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল, তখন নিউ ইংলণ্ড টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানির কয়েকজন কর্মী অগ্নিবেষ্টিত ও ধোঁয়ায় রুদ্ধ-শ্বাস হয়েও তাদের কর্তব্য পরিত্যাগ করে যেতে রাজী হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে সহসা হাওয়ার দিক পরিবর্তনে তারা যে দালানে আটকা পড়েছিল, সেই দালানটি রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। টেলিফোন কোম্পানি বিশ্বস্ততা ও সহিষ্ণুতার সম্মানে তাদের ব্রোঞ্জ মেডালে ভূষিত করে।

কয়েক বছর আগে জানুয়ারী মাসে একদিন নিউইয়র্ক রাজ্যে আলবানি-শেনেকটাডি অঞ্চল পুরু তুষারের চাদরে ঢাকা পড়েছিল।

৩৫,০০০ টেলিফোন বিকল হয়ে যায়।

তারপর শুরু হল দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; জনসেবামূলক অল্প প্রতিষ্ঠানই এরূপ সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ১৩০০ জন টেলিফোন কর্মী বরফের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলল। পরিচিত সবুজ রঙের গাড়ীতে অথবা ট্রাকে করে দলে দলে নানাধরনের টেলিফোন কর্মী ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল। তারা লাইন থেকে ৯০০ ভেঙ্গে-পড়া গাছ সরিয়ে ফেলে, টেলিফোন লাইনে ১২০০০ স্থান তারা মেরামত করে, ২০০০ হাজারের বেশী ভাঙ্গা বা ক্ষতিগ্রস্ত থাম তারা মেরামত করে বা বদলে দেয়।

বর্ধিত উত্তাপ ও বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবার বরফ ঝরে পড়তে লাগল; ভেঙ্গে গেল অসংখ্য বৃক্ষের শাখা, সেই সঙ্গে বারে বারে পুনঃস্থাপিত সার্কিটগুলোও নষ্ট হয়ে গেল। থাম শিথিল মাটিতে বসে যেতে লাগল; কোথাও কোথাও তারের টানে উঠে পড়েও গেল। পুরো একদিন কাজ করে ১৩০০ লোক মাত্র বিশটি সার্কিট স্থাপন করেছিল। তারা মেরামত করেছিল ৩,৩৩০টি সার্কিট, কিন্তু বরফের চাপে ৩৩১০টি আবার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ—সকল দিক থেকে নতুন নতুন দল প্রেরিত হল এই সংগ্রামে অংশ নিতে। শিকাগো ও নিউইয়র্ক থেকেও সারিবদ্ধ ট্রেইলার ভ্যান প্রেরিত হল। জরুরী যন্ত্রপাতির সঙ্গে তারা তেইশ মাইল নতুন কেবল্ এবং পাঁচশ তার নিয়ে এল। ট্রেইলার থেকে পথের পাশে নামিয়ে দেওয়া হল নতুন সব থাম—ভাঙা থাম বদলে দেবার জন্য। দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা চলল কাজ; অবশেষে বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা এল। সমস্ত টেলিফোন ব্যবস্থাও পুনঃ-সংস্থাপিত হল।

টেলিফোন ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অরণ্যের সঙ্গে যোগ রয়েছে। পুরুষানুক্রমে অরণ্য থেকে কোটি কোটি থাম সংগ্রহ করা হচ্ছে, এই থামই হয়ে দাঁড়িয়েছে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের বাহ্য প্রতীক।

দক্ষিণ ও পশ্চিমের সুদূর অরণ্যে এই সব খুঁটি কাটা হয়। পার্বত্য নদী দিয়ে ভাসিয়ে অথবা ট্রেইলারে বা ট্রাকে ভর্তি করে এগুলিকে কারখানায় আনা হয়। এখানে চেঁচে-ছুলে, কীটনাশক লাগিয়ে, প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা পরীক্ষা করে শেষে টেলিফোন কোম্পানিতে পাঠানো হয়। এগুলি ১৬ ফুট থেকে ৯০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, বড়গুলির ওজন হয় ৫,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত।

কিছুদিন আগে এই ব্যবসার একজন কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা সম্বন্ধে কয়েকটি আশ্চর্য কথা জানতে পারলাম। লোকটি কাঠুরিয়ার কাজ থেকে পরিদর্শকের কাজে উন্নীত হয়েছে—এ ব্যবসার তথ্যাদি তার বেশ জানা। সে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে টেলিফোনের সংখ্যা যত বাড়ছে, থামের সংখ্যা তত কমছে।'

'এর কারণ কী, বলতে পার?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সে উত্তর দিল, 'সহজেই পারি। নিউইয়র্ক শহরের যে অংশকে মানহাট্টান দ্বীপ বলে তার কথা ধরুন। এই অল্প কয়েক বছর আগেও এখানে ছিল থামের অরণ্য—তাদের মাথায় তারের জাল। অথচ মানহাট্টানে সর্বসমেত কয়েক হাজার ফোন ছিল মাত্র। বর্তমানে এখানে ১৫ লক্ষেরও বেশী ফোন হয়েছে, কিন্তু সমস্ত অঞ্চলে এখন থাম আছে মোট ছেষট্টিটি। ঐ শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে কিন্তু থাম আছে নব্বই হাজার। এ সব থাম কেবল্ ঝুলাবার জন্য বসানো হয়ে থাকে। ঐ সব কেব্লের প্রত্যেকটিতে শত শত তার রয়েছে, আগে যার প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে থামে ঝুলানো হ'ত।

'এ ছাড়া আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আগেকার দিনে সব তারই মাথার উপরে টাঙানো হ'ত। বর্তমানে এদের দুই-তৃতীয়াংশ তার মাটির নিচে নালা কেটে কেব্‌লে বসানো হয়। থাম অদৃশ্য হওয়ার আরেকটি কারণ হল রেডিও টেলিফোনের ব্যবহার প্রবর্তন;

এতে তার বা থাম কিছুরই প্রয়োজন নেই। যদিও এখনও প্রতি বছর দশ লক্ষেরও বেশী থাম টেলিফোন কোম্পানিগুলি ব্যবহার করছে, তবু আমার মত হল, এমন দিন শীঘ্রই আসবে যখন থাম বা তার একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারের পরিবর্তে ইথার সামগ্রিক পরিবাহক হিসাবে ব্যবহৃত হবে তখন, প্রচলিত হবে রেডিও এবং ইলেকট্রনিক্স্।

'সেদিন যখন আসবে, আসবে তো নিশ্চয়ই, বহু কোটি ডলার এবং কোটি কোটি টন প্রয়োজনীয় মালপত্র বেঁচে যাবে, লাগবে অন্য কাজে। মানুষের বহু শ্রমশক্তিও বাঁচবে, প্রযুক্ত হবে অন্য শিল্পে। ঝড়, তুষারবাত্যা, বন্যা ও বরফ সব মিলেও তখন আর পৃথিবীর সুদূরতম কোণের সঙ্গে মানুষের আলাপস্রোত রোধ করতে পারবে না।

'ভুলে যাবেন না, এমন একদিনও যায় না যেদিন ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু নতুন আবিষ্কার সংযোজিত না হয়। টেলিভিশন, রাডার, লোরান, শোরান—এছাড়াও আরও বহু অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত ব্যাপার শীঘ্রই হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের চমকিত করে দেবে। আমি জানি, কারণ আমি ইলেকট্রনিক বা বৈদ্যুতিক— উভয়বিধ যোগাযোগ কৌশল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বৃহত্তম উৎসের সঙ্গে পরিচিত। সেখানে আমি দেখেছি প্রায় সাত হাজার বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, কারিগর, সহায়ক ও সাধারণ কর্মী দিনে রাতে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।'

প্রশ্ন করলাম, 'কোন প্রতিষ্ঠান সেটি ?'

সে উত্তর দিল, 'বেল লেবরেটরিজ।' তারপর পাইপ থেকে পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলে চলে গেল তার কাজে।

যখন স্যামুয়েল ফিনলে মর্স ১৮৪৪ সনে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোরে বার্তা প্রেরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে তাঁর ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন, তখন তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্বন্ধে এবং পরবর্তীকালে এর যে উন্নতি ও প্রয়োগ হবে সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল একান্ত অস্পষ্ট। ব্যাঙের ছাতার মত আবিষ্কারক গজাতে লাগল ; কী করে টেলিগ্রাফের উন্নতিবিধান করা যায়, সংবাদ প্রেরণ করা ছাড়া অন্য কী প্রয়োজনে এর প্রয়োগ করা চলে—এ সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ধারণা ছিল। এঁরা ছাড়া যাঁরা কোর্টে মর্সের পেটেন্টের বৈধতা নিয়ে মামলা করেছিলেন, তাঁরা তো ছিলেনই।

ঊনবিংশ শতকের সপ্তম দশকের শেষ ভাগে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও টেলিগ্রাফ দেশের অর্থনীতিতে স্থান করে নিয়েছিল। বড় বড় কর্মব্যস্ত শহরে মাথার উপরে তারের জাল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। দ্রুতবর্ধমান যে কোন শহরের মতই নিউইয়র্কও নানাবিধ অপরাধের প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল—বিশেষ করে চুরির জন্য গৃহপ্রবেশ, চুরি, ডাকাতি ও অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নগর-পরিচালকদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'ত।

১৮৭১ সনে একদল জনহিতৈষী নাগরিক নিউয়র্কের সুনাম রক্ষার জন্য একটি কোম্পানি গঠন করেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অপরাধ নিবারণ ও অপরাধী অন্বেষণ এবং নাগরিকগণের নিরাপত্তা-বিধান। ঐ সময়ে দিনের বেলায় কাজকর্মের সময়েই শুধু টেলিগ্রাফ

লাইন কর্মব্যস্ত থাকতো। রাত্রিতে যখন অপরাধানুষ্ঠানের সময়, তখন টেলিগ্রাফের কাজ হ'ত না।

এই কোম্পানির নাম হল আমেরিকান ডিষ্ট্রিক্ট টেলিগ্রাফ কোম্পানি। এর গ্রাহকদের এরা দ্রুত পুলিসী ও অগ্নিনির্বাপক সাহায্য প্রদান করতো। গ্রাহকদের গৃহে, আপিসে ও ফ্যাক্টরীতে এরা একটি করে প্রেরকযন্ত্র বসিয়ে দিত; তার যোগাযোগ থাকতো একটি কেন্দ্রীয় আপিসের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় আপিস আবার যুক্ত ছিল অগ্নি ও পুলিস বিভাগের সঙ্গে।

প্রেরকযন্ত্রটি ছিল একটি সাধারণ বাক্স, তার সঙ্গে লাগান থাকতো একটি হাতল। হাতলটি ঘুরালেই কেন্দ্রীয় আপিসের একটি বোর্ডে একটি সংখ্যা জ্বলে উঠতো। অপারেটর গ্রাহকসংখ্যা খোঁজ করে ঐ গ্রাহকের ঠিকানা বার করে নিত। তারপর সে একজন বার্তাবাহককে পুলিসের কাছে ও অগ্নিনির্বাক বিভাগে পাঠিয়ে দিত, আরেক জনকে একটি অগ্নিনির্বাপক সহ সংশ্লিষ্ট গৃহে পাঠাতো।

আজকালকার পৌর যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে ঐ প্রেরকযন্ত্রকে একান্ত অপরিণত ও অকেজো বলে মনে হবে। তবু কিন্তু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও অনেক শহরে অবিলম্বে গৃহীত হয়েছিল।

১৯০১ সনে কোম্পানি গৃহে নৈশ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে। শীঘ্রই অন্যান্য শহরে নিরাপত্তা-সংগঠনগুলি প্রথম কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয় সংগঠনে পরিণত হল; তার নাম হল এ. ডি. টি.।

এই প্রসারিত কোম্পানিটি কিন্তু আশাতীত উন্নতি লাভ করল। যে কোন ব্যবসা বা শিল্পের জন্য পাহারা বা পরিদর্শন ব্যবস্থা দরকার সেখানেই এরা এদের নিরাপত্তা প্রবর্তন করল। ব্যাঙ্ক, ফ্যাক্টরি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাসায়নিক কারখানা, দোকান, মিউজিয়াম প্রভৃতি যেখানেই প্রহরীর প্রয়োজন সেখানেই এরা এদের ব্যবস্থা প্রসারিত

করে দিল। এরা শীঘ্রই নিজেদের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করল এবং বৈদ্যুতিক ও ইলেক্‌ট্রনিক নানা উপায় অবলম্বন করা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিল।

কেন্দ্রীয় স্টেশনগুলি এদের সকল কর্মপ্রেরণার উৎস। পৃথিবীর বেসরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে বৃহৎ। স্টেশনগুলিতে বড় বড় সব নিয়ন্ত্রণ বোর্ড থাকে ; সেই বোর্ডে অসংখ্য রঙীন আলো গ্রীষ্মের রাত্রির জোনাকিদের মত জ্বলতে নিবতে থাকে। এ. ডি. টি-র জটিল তারের জালের ভেতর দিয়ে যখন জরুরী আহ্বান, অপারেটরদের রিপোর্ট প্রভৃতি আসতে থাকে, তখন টেলিগ্রাফের চাবি অনবরত বাজতে থাকে—খট্‌খট্...খট্‌খট্।

বর্তমানে কোম্পানির ৪,৩০০ কর্মচারী রয়েছে ; তারা প্রায় পাঁচশত শহরে ২,৬০০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি রক্ষার অতি বিষম দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত আছে। এদের নিজস্ব বা ভাড়াটে বেসরকারী তার রয়েছে ৫৭,০০০ মাইল। কয়েক শত রেডিওসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ গাড়ী রয়েছে তাদের, তাছাড়া নানাধরনের যন্ত্রপাতি ও লেবরেটরীর জন্য এদের নিয়োজিত মূলধন প্রায় আড়াই কোটি ডলার। এদের গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে কতকগুলি ফেডার‍্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তাদের শাখা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী, এবং ফোর্ট নক্সে বিখ্যাত গোপন স্বর্ণভাণ্ডার। এছাড়া আমাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জাতীয় সম্পদ, গোপন পারমাণবিক সূত্রসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও এরা গ্রহণ করেছে।

রক্ষণকৌশলের দিক থেকে এ ডি. টি-র সর্বাপেক্ষা কার্যকরী যন্ত্র হল 'টেলি-এ্যাপ্রোচ'। এটি পুরানো ধরনের রেডিও গ্রাহক সেটেরই নূতনতর প্রয়োগ। কেউ ঐ ধরনের যন্ত্রের ডায়ালের দিকে হাত এগুলেই যে তীব্র শব্দ ও গর্জন উত্থিত হ'ত, সেটা অনেকেরই মনে থাকতে পারে। রেডিওর লোকেরা একে বলতো 'দেহের শক্তি' —সেটের-সন্নিকটবর্তী কোন লোকের দেহ এই ধরনের নৈতিক

অবস্থার সৃষ্টি করতো। বহু বছরের পরিশ্রমের ফলে এটার উন্নতি হল।

কিছুদিন আগে এ. ডি. টি. এঞ্জিনিয়ারগণ ক্ষুদ্র ধরনের এক রেডিও যন্ত্রে ঐ তীক্ষ্ণ শব্দ পুনরুজ্জীবিত করে। কোন সিন্দুক, ফাইলের ক্যাবিনেট, বা দলিল-পত্র ও মূল্যবান জিনিস রাখবার জায়গা, কোন আলমারি প্রভৃতির কয়েক ফুটের মধ্যে কোন লোক এসে উপস্থিত হলেই ঐ যন্ত্রে তা ধরা পড়ে এবং এ. ডি. টি-র কেন্দ্রীয় আপিসে একটি সঙ্কেত পাঠিয়ে দেয়। এই ক্ষুদ্র শব্দকারী যন্ত্র বহুবার সিন্দুক ভাঙ্গবার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এ. ডি. টি-কে বলা হয়েছে 'বিনিদ্র প্রহরী,' কারণ এদের বিশেষ ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রায় ৪০,০০০ অট্টালিকায় দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে পাহারা দেয়। অগ্নিকাণ্ড, সিঁদকাটা, আক্রমণ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দরজা খোলা, জানলা তোলা বা ভাঙ্গা প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে চক্ষের পলকে সংবাদ দেবার জন্য তৈরি থাকে যন্ত্রগুলি।

এ. ডি. টি প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পী স্যামুয়েল ফিনলে মর্স যদি তাঁর রঙ তুলি সরিয়ে রেখে তারের মাধ্যমে দূরবিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ না করতেন তবে এর অস্তিত্বই হয়তো কোনদিন সম্ভব হ'ত না।

স্থলভূমির দূরত্ব জয় করে মর্স বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যবর্তী সমুদ্র-পথের দূরত্ব জয়ের স্বপ্নও দেখেছিলেন। দুই মহাদেশের মধ্যবর্তী সমুদ্রতলে কেবল্ স্থাপন করার বিষয় তিনি কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন-পরিকল্পনা তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও অর্থপতিগণের বিশেষ সমর্থন লাভ করেনি। তাঁর ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সাফল্য তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে বলেও অনেকেই কানাকানি করতো। পথিকৃতের অদমনীয় তেজে চারিদিক থেকে যত বাধা তিনি পেয়েছেন সে-সব সত্ত্বেও মর্স ভগ্নোদ্যম হননি। তাঁর এক খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার বন্ধু

এই পরিকল্পনার বিরাট খরচা, বিপদ ও ঝুঁকি প্রভৃতি তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সমুদ্রতলে কেবল্ স্থাপনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেননি।

ইতোমধ্যে, তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা যে অবাস্তব নয় একথা প্রমাণ করবার জন্যই যেন তিনি নিউইয়র্ক ও নিউজারসির মধ্যবর্তী পোতাশ্রয়ের তলদেশে টেলিগ্রাফ তার স্থাপন করবার ভার লাভ করতে সমর্থ হলেন।

অসংখ্য অসুবিধা এবং কয়েকবারের অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কাজটি সমাপ্ত করলেন তিনি। টেলিগ্রাফ কোম্পানি কেবল্‌টি বহু বৎসর ধরে ব্যবহার করেছিল।

প্রায় ঐ সময়েই এক ধর্মযাজকের পুত্র সাইরাস ফিল্ড তরুণ মর্সের এই অসফল আকাঙ্ক্ষার কাহিনী শুনে পরিকল্পনার উদ্ধত দুঃসাহসের জন্যই এর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই মহাদেশকে যিনি ২৪০০ মাইল কেবল্ দ্বারা যুক্ত করতে পারবেন তিনি গৌরব ও অর্থলাভে সমর্থ হবেন, ফিল্ডও সেই স্বপ্নই দেখতে লাগলেন।

ফিল্ড একটি কাগজের মিলে কাজ করতেন। এখানে তিনি তাঁর বয়সের অনুপাতে অতি দুর্লভ যোগ্যতা ও বাস্তব ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্রম, মেধা ও সুপ্রচুর বাস্তববুদ্ধির জন্য তিনি অতি দ্রুত ঐ কোম্পানির কাউন্সিলে উন্নীত হলেন। তাঁর বয়স বিশের কোঠা পার হবার আগেই তিনি প্রথমে সহ-সভাপতি, পরে সভাপতি এবং শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যবসার মালিক হলেন।

কাগজ উৎপাদনের কাজ করতে করতে সব সময়ই ফিল্ডের দুইটি বিষয়ে একান্ত আগ্রহ ছিল। একটি হল তাঁর ব্যবসা—দিনের বেলায় তিনি দিব্য উন্মাদনাবশে যেন এই কর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। আরেকটি তাঁর জীবনের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের প্রেরণা—নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ড পর্যন্ত কেবল্ স্থাপনের পরিকল্পনা।

প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছবার পূর্বেই বেশ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে ফেললেন। তাঁর উন্নতিশীল ব্যবসার সকল দায়িত্ব পালন করে তিনি ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। যে সর্বগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা নিয়ত তাঁর হৃদয়ে জাগরূক ছিল এবার তিনি সেই প্রেরণা সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলেন।

ফিল্ডের এই কেবল্ স্থাপন করবার আকাঙ্ক্ষার কথা তখন চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। তাঁর অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিউইয়র্কে এলেন। ইনি নিউ বারনসউইক থেকে প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্রতলে কেবল্ স্থাপনের কাজে সাফল্য লাভ করেছেন ইতঃপূর্বেই।

পরিকল্পনা এবং তা কার্যকরী করার বিশেষ ব্যবস্থার কথা যখন ফিল্ডকে জানানো হল তখন তিনি এতদিন যে বৃহৎ পরিকল্পনা অন্তরে পোষণ করে এসেছেন তা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পেলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি নিউইয়র্ক, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড এণ্ড লণ্ডন টেলিগ্রাফ কোম্পানি সংগঠনের এবং নিজেই তার মূলধনের বৃহৎ অংশ যোগাবার দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন। তিনি একটি ব্রিটিশ কণ্ট্রাক্টর কোম্পানিকে সেণ্ট লরেন্স উপসাগরে প্রিন্স্ এডওয়ার্ড দ্বীপ এবং সেখান থেকে মূল ভূভাগ পর্যন্ত কেবল্ স্থাপনের কণ্ট্রাক্ট দিলেন।

ভাগ্যক্রমে বিশেষ কোন অসুবিধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হল না তাদের। প্রায় অনায়াসেই কেবল্ স্থাপন করল তারা। ছোট খাটো দু'চারটে দুর্ঘটনা ঘটল, যা এসব বৃহৎ প্রাথমিক কাজে সাধারণত ঘটে থাকে। মূল ভূভাগ থেকে প্রথম টেলিগ্রাফ বার্তা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড কেবল্ দিয়ে দুই মহাদেশ সংযুক্ত করার জন্য অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বসলেন। বলা বাহুল্য, এত দীর্ঘ ও শক্ত তারের কথা ইতঃপূর্বে আর কখনও কল্পনাও করা হয়নি।

একটি নতুন ও বৃহত্তর কোম্পানি গঠনের আশায় ফিল্ড সত্বর গিয়ে

ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা প্রথম এ পরিকল্পনায় টাকা খাটানোর ব্যাপারে বিশেষ সাহস দেখায়নি ; এটাকে তারা একটা বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার বলেই মনে করেছিল। কিন্তু ফিল্ড শীঘ্রই তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বহু শেয়ার বিক্রয় করে ফেললেন। প্রয়োজনীয় মূলধনের তিন-চতুর্থাংশ তারা যোগান দিল। বাকী শেয়ার ফিল্ড কিনে ফেললেন।

অংশীদারদের অনেকেই সরকারী মহলে বিশেষ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ব্রিটিশ নৌবিভাগকে নবগঠিত আটলান্টিক টেলিগ্রাফ কোম্পানিকে একটি যুদ্ধ জাহাজ ধার দিতে রাজী করাতে ফিল্ডের বিশেষ কিছু অসুবিধা হল না। তার পাতবার জন্য নিয়োজিত হল ব্রিটিশ ক্রুজার এইচ্. এম্. এস্. এগামেম্নন। যুক্তরাষ্ট্রও এই কাজের জন্য নায়গারা নামে নৌবহরের একখানা জাহাজ প্রদান করল।

বহু মাস ধরে যোগাড়যন্ত্র করার পরে স্থির হল ১৮৫৭ সনের বসন্তকালে তার বসাবার অভিযান শুরু হবে। কার্যপ্রণালীর মধ্যে অন্ততঃ কাগজেপত্রে অসম্ভব কিছু ছিল না। আয়ার্ল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে ভ্যালেন্শিয়া দ্বীপ থেকে যাত্রা করার পূর্বে নায়গারার ডেক ও খোল সব কয়েশ শ' মাইল কেব্‌লে ভর্তি করে নেওয়া হল। ঐখানে তারের পূর্বপ্রান্ত টেলিগ্রাফ যন্ত্র এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সঙ্গে যুক্ত করা হল।

নায়গারা ক্রমশ তার সযত্ন-নির্ধারিত পথে এগিয়ে চলল, ছেড়ে চলল সে ফুটের পর ফুট, গজের পর গজ, মাইলের পর মাইল কেবল্‌। আবহাওয়া ছিল চমৎকার, সমুদ্র ছিল শান্ত—সবাই মনে করল কাজটা লাটাই থেকে সূতা টানার মতই সহজ। পেছনে পেছনে অগ্রসর হল এগামেম্নন—তার ডেক এবং খোলও তারে ভর্তি। ব্যবস্থা ছিল যখন নায়গারার কেবল্ ফুরিয়ে যাবে তখন এগামেম্নন ঐ জাহাজ আবার কেবল্ বোঝাই করে দেবে যাতে কাজটা প্রায়

বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সকল ব্যবস্থাই ভঙ্গুর—ভাগ্যের অদৃষ্টপূর্ব খেয়ালে ভেঙ্গে পড়ে যে কোন মুহূর্তে।

নায়গারা যখন আইরিশ উপকূল থেকে তিনশত মাইল এগিয়ে গেছে তখন উত্তরপূর্ব দিকের এক ঝড় একটানা ত্রিশ ঘণ্টা ধরে নির্দয়-ভাবে তাকে বিপর্যস্ত করতে লাগল। কেব্‌লের দ্বারা যুক্ত হয়ে আছে সে সমুদ্রের তলদেশের সঙ্গে—অসহায় ভাবে ঝড়ের আক্রমণ সহ্য না করে তার কোন উপায়ই রইল না। পর্বত-প্রমাণ সব ঢেউ তার ডেক ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, প্রাণভয়ে ভীত নাবিকেরা ছুটোছুটি করছে, দড়িদড়া ধরে চেষ্টা করছে প্রাণ বাঁচাতে। ইচ্ছামত নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে না সে; একেবার ছিট্‌কে উঠে যাচ্ছে গর্জনশীল প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাথায়, আবার সবেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে নিচে।

জাহাজের লাইফবোটগুলো জ্বালানী কাঠের মত টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে গেল, নিচের বিরাট গলুইটাও বেঁকে গেল। পালের কাপড়ে ও দড়িতে হাওয়া তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকার, ডেকের উপর দিয়ে উন্মত্ত জলরাশির গর্জন—সব মিলে এক লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে যেন।

কিন্তু সমুদ্রের এই প্রবল উৎপীড়নের মধ্যেও সেই সুদৃঢ় প্রাচীন জাহাজ বহুদূর দ্বীপের সঙ্গে সংযুক্ত কেবল্‌ কিছুতেই ছেড়ে দিল না। ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রামের সাময়িক এক বিরতি-মুহূর্তে জাহাজ থেকে মর্স সঙ্কেতে বার্তা প্রেরিত হল ভ্যালেন্‌শিয়া কেন্দ্রে, 'ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রবাহিত হচ্ছে, কেবল্‌ ধরে আছি।'

কয়েক মিনিট পরেই সমুদ্র দৈত্যের শক্তিতে জাহাজকে সবেগে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল; তার পেছন দিক চারতলা বাড়ীর সমান উঁচুতে উঠে গেল, মুখের দিকটা জলে ডুবে গেল। সে এক চূড়ান্ত আতঙ্কের মুহূর্ত; সেই মুহূর্তেই বন্দুকের গুলি ছোড়ার মত শব্দ হল, পনর ফ্যাদম তার মুচ্‌ড়ে উঠে এল সমুদ্র থেকে। কেবল্‌ ছিঁড়ে গেছে। তিনশ' মাইল দামী তার চিরদিনের জন্য সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেল।

ঝড় শান্ত হল। তারপর তিনদিন ধরে নায়গারা আঁকশি বাঁধা শিকল দিয়ে সমুদ্রতল আঁচড়ে আঁচড়ে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখল, কিন্তু ফল হল না কিছুই। এই দুঃসংবাদে ফিল্ডের একটুও ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি বললেন, 'আবার চেষ্টা করব আমরা। লাভ করতে হলে ক্ষতি স্বীকার করতেই হয়।'

দ্বিতীয় অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হতে হতে এক বছর কেটে গেল। ইতোমধ্যে একটি নতুন অভিযান প্রণালী ঠিক করা হল। এগামেম্নন ও নায়গারা মধ্যসমুদ্রে মিলিত হল। প্রত্যেক জাহাজে বার শ' মাইল করে কেবল্ বোঝাই করা ছিল। ঐখানে দুই জাহাজের কেবল্ প্রান্ত সংযুক্ত করা হল। আয়োজন সমাপ্ত হতেই জাহাজ দুখানা সেখান থেকে এ ওর বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল —একটি চলল পুব দিকে আরেকটি পশ্চিম দিকে। দু'জাহাজ থেকেই সেই সংযুক্ত কেবল্‌টি ছেড়ে ছেড়ে চলল তারা।

জাহাজ দুটি তারের দ্বারা যুক্ত থাকায় পরস্পরের সঙ্গে বার্তা-বিনিময় করতে পারছিল তারা। প্রথম বারের খামখেয়ালের কথা স্মরণ করেই যেন এবার আবহাওয়া ছিল একান্ত সদয়। অতি শান্ত সমুদ্র, উষ্ণ সূর্যালোক আর চন্দ্রালোকিত রাত্রি—সব কিছু অভি-যাত্রীদের অনুকূল। কাজ এগিয়ে চলল ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আশা বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

একদিন শুভ প্রভাতে এগামেম্নন থেকে আনন্দধ্বনি উত্থিত হল 'মাটি দেখা যাচ্ছে, মাটি দেখা যাচ্ছে!' নাবিকেরা উৎসাহে চীৎকার জুড়ে দিল; এগামেম্ননের বাঁশী অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা পরে নায়গারাও কেব্‌লে টেলিগ্রাফ করে জানাল তাদেরও গন্তব্যস্থল দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই গন্তব্যস্থল আইরিশ উপকূল।

ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তারের দুই প্রান্ত তীরে নামিয়ে নেওয়া হল এবং ক্যানাডা ও আয়ারল্যাণ্ডে টেলিগ্রাফ স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হল ঐ প্রান্তগুলি। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশ পর্যন্ত সমুদ্রতলে

২৪০০ মাইল কেবল্ স্থাপিত হল। আটলান্টিকের দুই তীরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল এতদিনে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে শত শত বার্তা ঐ কেব্‌লের মাধ্যমে এক পার থেকে অপর পারে প্রেরিত হতে লাগল। আটলান্টিক টেলিগ্রাফ কোম্পানির অংশীদারেরা আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করল। ফিল্ড বিজয়ীর অভিনন্দন পেল। সমুদ্রের দুই তীরে চললো আনন্দোৎসব।

তারপর বজ্রপাতের মতই সহসা দুর্ঘটনা ঘটল। অকারণেই কেবল্‌টা নিঃশব্দ হয়ে গেল, একেবারে নিশ্চুপ। এঞ্জিনিয়ারগণ অজস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাতে একটুও সাড়া জাগাতে পারলো না। বহু আলাপ-আলোচনার দ্বারা তারা স্থির করল যে কেব্‌লের আবরণী হয়তো কোথাও ফেটে গেছে এবং ধাতব তার লোনা জলের সংস্পর্শে আসায় বিদ্যুৎপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

বেদনাদায়ক হলেও সবাই বুঝতে পারলো যে শত শত মাইল কেব্‌লের মধ্যে সূচের মত একটি ফুটো খুঁজে বার করা মানুষের শক্তির বাইরে। প্রথম আটলান্টিক কেবল্ পরিত্যক্ত হল। আজও সেই মরচেধরা তামার তারের বন্ধন দুই মহাদেশকে আবদ্ধ করে রেখেছে।

আটলান্টিক টেলিগ্রাফ কোম্পানি তার বিজয় মুহূর্তেও সাড়ে সাতাশ লক্ষ ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে গেল। ফিল্ডের নিজেরও ক্ষতি হল কয়েক লক্ষ ডলার।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে অন্য কোন কম সাহসী মানুষ যে কোন কেবল্-পরিকল্পনা এড়িয়ে চলতো। কিন্তু ফিল্ড এত সহজে তাঁর স্বপ্ন ছাড়তে রাজী ছিলেন না। তিনি তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রইলেন—কোন দিন, যে কোন উপায়ে তিনি সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তর্মহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। ইতঃপূর্বেই তিনি নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড ও প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে সমুদ্রতলে কেবল্ স্থাপন করেছেন। তাঁর বৃহত্তর পরিকল্পনা কার্যকরী করার পক্ষে এখন বাধা কেবল দূরত্বের।

কেবল্‌ দিয়ে আটলান্টিকের দুই উপকূল যুক্ত করার ব্যাপারে ফিল্ডের প্রচেষ্টা শুরু করার কয়েক দশক আগে গ্রেট ইস্টার্ণ নামক একখানা অতিবৃহৎ জাহাজ নির্মিত হয়েছিল। তৎকালীন মানুষের কল্পনার অতীত ছিল এ জাহাজের আকার। ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষ সমুদ্রে এর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের সংবাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো। আধুনিক কালে কুইন এলিজাবেথ অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে তুলনায় যেমন, সেকালের জাহাজের সঙ্গে তুলনায় গ্রেট ইস্টার্ণও ছিল তেমনি।

এর প্রায় একশ বছর আগে ইউরোপ থেকে দেশত্যাগীদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাদের বহনের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল এই জাহাজ; সেকালের পক্ষে আরামের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত এতে ছিল। সেদিনের বৃহত্তম জাহাজের চেয়েও এ জাহাজ ছিল পাঁচগুণ বড়; ৭০০ ফুট ছিল তার দৈর্ঘ্য। বিশেষজ্ঞদের মত ছিল, এই দৈর্ঘ্যের জন্যই ঝড়ে পড়লে সে রক্ষা পাবে না। ৪০০০ যাত্রীর স্থান ছিল এই জাহাজে—'গ্রেট শিপ কোম্পানির' অংশীদারগণ দ্রুত মুনাফা করার স্বপ্ন দেখেছিল। মোট ছ'টি মাস্তুল, পালের আয়তন এক একর, দু'পাশের চাকা চালনার জন্য তিনটি শক্তিশালী এঞ্জিন, পেছনে বিশ ফুট স্ক্রু প্রপেলার—সকলে মনে করতো এ জাহাজ অপরাজেয়।

যে কোন বন্দরে প্রদর্শনের জন্য হাজির করা হলে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হ'ত সমুদ্রের এই আধুনিক বিস্ময় প্রত্যক্ষ করতে। কোথাও নোঙর করলে তার আশেপাশে ফেরিওয়ালা, বাজিকর প্রভৃতিদের বাজার বসে যেত। খবরের কাগজে তার সম্বন্ধে দু'চার কলম লেখা বেরুতো। কিন্তু তার যাত্রী-সংখ্যা একান্ত কম। তার দীর্ঘজীবনে দু'চার বারই শুধু সমুদ্রযাত্রায় লাভ দেখা গিয়েছিল। ফলে বহুবার তার মালিকানা বদল হল এবং প্রত্যেকবার মালিক বদলের সাথে সাথে আরও বেশী মূলধন নষ্ট হতে লাগল।

কিন্তু এই হতভাগ্য জাহাজের বিচিত্র ইতিহাসে বারে বারে পাওয়া গেল গুচের নাম। মালিকানা বদল হলেও গুচ প্রত্যেক বারই স্টকের

একটি বেশ বড় অংশ ধরে রাখবার ব্যবস্থা করতো। শেষ পর্যন্ত যখন জাহাজখানা নিলামে উঠলো তখন ২৫,০০০ পাউণ্ড দিয়ে ওটা সে নিজেই কিনে নিল। অনেকে ভাবল তাঁর মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়ে গেছে; কেউ কেউ ভাবল সে একদম উন্মাদ হয়ে গেছে, কারণ কাণ্ডজ্ঞান বজায় থাকলে কেউই এত বড় একটি শ্বেতহস্তীর ভার গ্রহণ করতে পারে না। গুচ কিন্তু নীরব হয়েই রইল। তার মাথায় যে দূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল তার খবর সে ছাড়া তার কেউ জানতো না।

ইতোমধ্যে ফিল্ডের সেই দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার একটুও পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি তখনও ধরে আছেন আটলান্টিকের এপার ওপার কেবল্ বসাতে পারলে অর্থ ও যশ দুইই লাভ হবে। প্রথম তার নষ্ট হয়ে যাবার পরে প্রায় ছয় বছর কেটে গেছে! বহু অসুবিধা সত্ত্বেও, তন্মধ্যে আর্থিক অসুবিধাই বেশী, ফিল্ড কেবলমাত্র সুশৃঙ্খল ও নিপুণ সংগঠন শক্তির বলেই আটলান্টিক কোম্পানিকে তখনও টিঁকিয়ে রেখেছিলেন।

একদিন তিনি সংবাদ পেলেন যে, একটি ব্রিটিশ কোম্পানি চামড়ার মত শক্ত কেবল্ ইন্সুলেশন তৈরি করেছে। এই আবরণী খুব টেকসই, এবং লোনা বা মিঠা, কোন জলই তাকে পচাতে বা ক্ষয় করতে পারে না। যুদ্ধের ঘোড়া বিউগলের বাজনা শুনলে যেমন নেচে ওঠে তিনিও তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই সংবাদ সাইরাস ফিল্ডের মনে আবার সব স্বপ্ন ও সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললো।

এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ কোম্পানির একজন প্রতিনিধি ফিল্ডের সঙ্গে দেখা করতে এল। সে নতুন পদ্ধতিতে তৈরি কেব্‌লের খানিকটা কেটে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এতে মধ্যস্থলে একটি মোটা তামার তারের চারিপাশে ছ'টি সরু আবরণযুক্ত তামার তার; সবগুলি একত্রে জড়িয়ে রয়েছে আবার কয়েক পরত জল নিরোধক ইন-সুলেশন; তারপরে আবার বাইরে আবরণযুক্ত তার জড়িয়ে দেওয়া। সমগ্র কেবল্‌টির ব্যাস সোয়া ইঞ্চির মত।

ফিল্ড মুগ্ধ হয়ে গেল। ছ'বছর আগে যদি এমনি কেবল্ পাওয়া যেত! কিন্তু অতীত অসাফল্যের জন্য শোক করে লাভ কী? ভবিষ্যৎকে মনে হল সম্ভাবনায় পরম উজ্জ্বল। দেখা গেল যে আগন্তুক গুচ ছাড়া আর কেউ নয়। নতুন কেবল্ নির্মাতা এবং এর পেটেন্ট স্বত্বের মালিক ব্রিটিশ কোম্পানির ইনি একজন বড় অংশীদার।

আটলান্টিকের এপার ওপার কেবল্ স্থাপনের জন্য ফিল্ডের খেয়ালের কথা গুচ জানতেন। সত্বরই তিনি সেই কথা পাড়লেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে ফিল্ডের আটলান্টিক টেলিগ্রাফ কোম্পানি আর তাঁর ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান, টেলিগ্রাফ কোম্পানি এণ্ড মেইনটেনান্স কোম্পানি সম্মিলিত করে নতুন কোম্পানি গঠন করা হোক। এরা কেবল্ তৈরি করবে, আবার গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে এই কেবল্ স্থাপনও করবে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় মূলধনের বৃহৎ একটি অংশ গুচই সরবরাহ করবে।

ব্যবসায়ী ফিল্ড ব্যবসায়ীর মতই এই আপাত অভ্রান্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন 'কী করে দু'হাজার চারশ মাইল লম্বা এত ভারী কেবল্ বহন করা হবে? একটি সমগ্র নৌ-বহরের প্রয়োজন হবে এতে। তাছাড়া জোড় লাগানোর প্রশ্নও রয়েছে; আর সম্ভাবনা রয়েছে ভবিষ্যতে আবরণী ছিদ্র হয়ে পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার।'

এই প্রশ্নের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন চতুর গুচ। তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা একখণ্ডে সমগ্র কেবল্‌টি একটা জাহাজে বহন করে নেবো। জোড়া লাগানোর কোন প্রয়োজন হবে না।'

ফিল্ড বিশ্বাস করতে পারলেন না। 'কী করে তা সম্ভব হবে?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

গুচের মুখে সুচতুর হাসি ফুটে উঠল। 'আমরা গ্রেট ইস্টার্ণকে কাজে লাগাবো,' তিনি বললেন, 'জাহাজটি এখন সম্পূর্ণ আমাদের দখলে। ওতে কয়েকটি কেবল্ বোঝাই করলেও আরও জায়গা খালি থাকবে।'

চুক্তি হয়ে গেল। কেবল্ বসাবার কাজের উপযুক্ত করে সেই বৃহৎ জাহাজের সংস্কার করা হল। এটা ভেঙ্গে, ওটা খুলে হাজার হাজার মাইল তার বহনের উপযুক্ত করে তোলা হল তাকে।

কয়েক মাস কেটে গেল এই বৃহৎ অভিযানের আয়োজনে। প্রত্যেকটি চারতলা দালানের সমান উঁচু তিনটি লৌহ ট্যাঙ্কে চব্বিশ শ' মাইল দীর্ঘ কেবল্ লাটাইয়ে সূতার মত সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা হল। ডেকের উপর নির্মিত একটি বিশেষ কক্ষে নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো হল। জাহাজের পেছনে তার স্বচ্ছন্দে নামিয়ে দেবার জন্য শক্তিশালী হুইল স্থাপন করা হল। জাহাজের গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে যাতে কেবল্ নামিয়ে দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে একদল নাবিককে বিশেষ শিক্ষাও দেওয়া হল।

যখন সকল আয়োজন সমাপ্ত হয়ে গেল তখন একদিন রাজপরিবারের সকলে ব্রিটিশ অভিজাতদের কয়েকজনকে সঙ্গে করে সেই জাহাজ পরিদর্শন করতে এল। জাহাজে উঠে তাঁরা এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলেন। কেব্‌লের দুই মুখ প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে একটি টেবিলের উপর রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় কেব্‌লে প্রথম বার্তা প্রেরিত হল। গুচের ইঙ্গিতে একজন টেলিগ্রাফার টরে টক্কা করে বার্তা প্রেরণ করল, 'ঈশ্বর রানীকে রক্ষা করুন।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাহকযন্ত্রে বার্তাটি ধরা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হল সকলের কণ্ঠে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে কেবল্‌টি বেশ চমৎকার অবস্থায় রয়েছে।

পরদিন গ্রেট ইষ্টার্ণ শিয়ারনেসে তার পোতাশ্রয় ছেড়ে ভ্যালেন্‌শিয়া দ্বীপের দিকে এগিয়ে চললো। এই দ্বীপে কেব্‌লের ইউরোপীয় স্টেশন। ঐ বৃহৎ জাহাজ ঐ দ্বীপের সন্নিকটে জল অত্যন্ত কম বলে কিনারে ভিড়তে পারলো না। একটি ক্ষুদ্র জাহাজে কেব্‌লের এক প্রান্ত তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুলে দেওয়া হল।

সেই জাহাজ তীরে ভিড়িয়ে নবনির্মিত টার্মিন্যাল স্টেশনে স্থাপিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সঙ্গে কেব্‌লের প্রান্ত সংযুক্ত করা হল।

রাজকীয় নৌবহরের দুখানা জাহাজের পরিচালনায় গ্রেট ইস্টার্ণ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড যাত্রা করল। ঘণ্টায় ছয় নট বেগে অগ্রসর হতে লাগল সে, অনবরত ছেড়ে চললো কেবল্, যেন একটি রাক্ষুসে মাকড়সা জাল বুনে চলেছে। সুন্দর আবহাওয়া, শান্ত সমুদ্র—দ্বিতীয় রাত্রি পর্যন্ত সব কিছু ঠিকমত চললো। তারপর গ্যালভ্যানোমিটারে ধরা পড়লো লাইনে কিছু গোলমাল হয়েছে। ভ্যালেনশিয়া থেকে মাঝে মাঝে যে সংবাদ আসছিল তা থেমে গেল। গ্যালভ্যানোমিটারে শুধু গোলমালই ধরা পড়লো না, কোথায় গোলমাল তারও যেন নির্দেশ পাওয়া গেল।

এঞ্জিনিয়ারগণ যন্ত্রের নির্দেশিত তথ্যের ভিত্তিতে অনবরত চেষ্টা করে, জাহাজ ও কেব্‌লের মধ্যে যেখানে বাধা সৃষ্টি হয়েছে সে জায়গার দূরত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাদের যে কোন দুজনের গণনার মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। সবচেয়ে কম ও সবচেয়ে বেশী দূরত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেল পঞ্চাশ মাইল। ফিল্ড, গুচ ও জাহাজের ক্যাপ্টেনের মধ্যে আলোচনা হয়ে স্থির হল যে যতটা প্রয়োজন কেবল্ তুলে নিতে নিতে জাহাজ পিছিয়ে যাবে।

দেখা গেল কাজটা অত্যন্ত কঠিন। জাহাজের পেছনে কেবল্ তুলে গুছিয়ে রাখা সম্ভব নয়, কাজেই জাহাজ পিছিয়ে যেতে পারলো না। গুরুতর ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়েছে তখন। কেবল্‌টি কেটে তার প্রান্ত একটি ভাসমান বয়ার সঙ্গে বেঁধে রাখার প্রয়োজন হল, যাতে তারের প্রান্ত আবার খুঁজে পাওয়া যায়। দশ মাইল অগ্রসর হয়ে তারের ত্রুটি পাওয়া গেল। দেখা গেল এক টুকরা তার কেবল্‌ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে আছে। সবার কাছেই মনে হল কোন শত্রু কেবল্‌ পরিকল্পনা বানচাল করে দেবার জন্যই এই নাশকতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে।

কেব্‌লের অন্ধকার ট্যাঙ্কে পাহারা বসানো হল। অপরিজ্ঞাত ধ্বংসকারীর হাত হতে কেবল্‌ রক্ষার জন্য ফিল্ড এবং গুচও ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাদের প্রহরা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কেবল্‌ খারাপ হতে লাগল। এমন কি দার্শনিক, আশাবাদী ফিল্ডও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রত্যেক বাধাই সাফল্যের সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছিল।

জাহাজ অর্ধেক পথ (প্রায় বারশ মাইল) অতিক্রম করার পরে গ্যালভ্যানোমিটারে আবারও গোলমাল ধরা পড়লো। কেব্‌ল গুছিয়ে জাহাজে তোলার কাজ কেবল শুরু করা হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ এক তীব্র শব্দ শোনা গেল, ছিঁড়ে গেল কেবল্‌। ছেঁড়া প্রান্ত সাপের মত পিছলে সমুদ্রে নেমে গেল। ডেকের লোকেরা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল, এ যেন এক মহা বিয়োগান্ত ঘটনা। সমুদ্রতল সেখানে তু'মাইল গভীরে। সেখানে তলা আঁচড়ে কেবল্‌ তোলার চেষ্টা বোকামি বলেই মনে হল সকলের কাছে।

একজন কিন্তু আপত্তি করতে লাগল। কেবল্‌ কোম্পানির প্রতিনিধি একজন ইঞ্জিনিয়ার দেখলো তার কোম্পানি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন। সে সঙ্গে সঙ্গেই তার তোলার চেষ্টা শুরু করার জন্য জেদ করতে লাগল। তখন বাতাস উঠেছে জোর, সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে। তা সত্ত্বেও সেই প্রায় অসম্ভব কাজ শুরু করা স্থির হল। কয়েক মাইল তাদের দড়ির সঙ্গে লোহার আঁকশি বেঁধে সব কিছু প্রস্তুত করা হল। ক্যাপ্টেন স্থির করল জাহাজ কয়েক মাইল সরিয়ে নিয়ে লম্বভাবে কেব্‌লের অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। জাহাজের পেছন দিক দিয়ে ঐ আঁকশি যত দ্রুত সম্ভব নামিয়ে দিয়ে জাহাজ চালিয়ে দেওয়া হল।

জোর হাওয়ার টানে প্রকাণ্ড জাহাজখানা ধীরে ধীরে এগুতে লাগল, পেছনে ঝুলে আছে চার মাইল তার। বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ করে এল, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টি হতে লাগল; শেষে মধ্যরাত্রির দিকে অবিরল ধারায় বর্ষণ শুরু হল। এমন সময়

তারে টান পড়লো, সবাই তাকালো সেই দিকে। আঁকশিতে কিছু একটা আটকে গেছে।

সকালের দিকে লোহার দণ্ডের মত টান টান হয়ে উঠলো তারটি। নাবিকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল; তার টেনে তোলার আদেশ দেওয়া হল। অনবরত হুইল ঘুরতে লাগল, বহু ফ্যাদম্ তার উপরে উঠে এল। লোহার আঁকশি সমুদ্রতল থেকে উঠে আসার পরেও তারে একই রকম টান বজায় রইল। কারও কোন সন্দেহ রইল না যে হারানো কেবল্‌টি উঠে আসছে।

সবাই তখন জয় নিশ্চিত বলে মনে করছে; সহসা টানা তারটি ঠাস্ করে ছিঁড়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল। হতাশার কালো মেঘ দেখা দিল সকলের মুখে। মনে হল যেন সমুদ্রের অপদেবতা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। একদল গিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে অনুরোধ জানালো বৃহত্তর কোন দুর্বিপাক ঘটার আগে অপয়া কেবল্‌টি পরিত্যাগ করে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার জন্য। ক্যাপ্টেন অস্বীকার করল। ফিল্ড জাহাজের গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়েছিলেন, এগিয়ে এসে অসন্তুষ্ট নাবিকদের শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমরা সবাই এই অভিযানে যোগদান করেছি, যতটা স্ব-স্ব মাতৃভূমির সেবার জন্য, ব্যক্তিগত লাভের জন্য ততটা নয়। একাজ যখন শুরু করা হয় সবাই জানতাম কাজটি কঠিন, কিন্তু একে অসম্ভব বলে কেউ মনে করিনি। ঘটনাক্রমে দেখা যাচ্ছে কাজটি দুরুহই বটে, কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে,না যে এ কাজ অসম্ভব। পুরোনো নীতিকথা স্মরণ করুন, 'একবার কৃতকার্য না হলে বারে বারে চেষ্টা কর।' একে একে ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানিয়ে লোকগুলি নিজ নিজ কাজে ফিরে গেল।

আবার কেবল্ তোলবার জন্য আঁকশি নামানো হল। কিন্তু কয়েকদিন দুর্যোগ থাকায় অনুসন্ধান সম্ভব হল না। তারপর এক-দিন সকালে মেঘ কেটে নীল আকাশ দেখা দিল। স্নিগ্ধ হাওয়ায় সমুদ্র রেশমের মত মসৃণ হয়ে গেল। উৎসাহ ফিরে এল সকলের

মনে, আবার কাজে লাগল সকলে। একই পথে কেবল্ তোলার অভিযান এগিয়ে চললো জাহাজের সমস্ত তার জলে নামিয়ে। সঙ্গের একখানা জাহাজ থেকে সঙ্কেতে 'এবারের যাত্রার সাফল্য' কামনা করা হল। গ্রেট ইস্টার্ণ সঙ্কেতে শুভেচ্ছুকে ধন্যবাদ জানালো।

কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্রতলে আঁকশিতে কিছু একটা বেধে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবার সেই তার টেনে তোলার কাজ চললো। সারারাত কাজ চললো, তারপর ভোরের ঠিক আগে আবার তার ছিঁড়ে গেল। আটকানো জিনিসটি যাই হোক ডুবে গেল অতল সমুদ্রে। হতাশা ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো সকলের মুখে। তবু আরেক বার চেষ্টা করা হবে স্থির হল।

এবার তার সমুদ্রতল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেতারের তারের মত টান টান হয়ে গেল। বোঝা গেল আঁকশিতে কেবল্‌টি আবার আটকেছে। খুব সাবধানে তার টানার কাজ চললো এবার, কারণ সকলেই জানতো এবার ব্যর্থ হলে ১২০০ মাইল কেবল্ চিরদিনের জন্য নষ্ট হবে, লাখ লাখ ডলার ক্ষতির প্রশ্ন তো আছেই। এবার ছিঁড়লে আর অবশিষ্ট তারে কাজ চলবে না। তাই এই তাদের শেষ ভরসা, শেষ আশা।

ক্রমশ বেশ ভালভাবে উঠে আসছিল তার, ধীরে ধীরে, একটু একটু করে। তারের উপর টান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কেবল্‌টি বেশ দৃঢ়ভাবে আটকানো গেছে এ বিষয়ে তারা এবার নিশ্চিন্ত।

সকলেরই স্নায়ু উত্তেজিত, সাহসও বেড়ে গেছে, কিন্তু সতর্কও রয়েছে সবাই। টানধরা তারের কাছ থেকে সকলেই দূরে সরে আছে। গুচ আর ফিল্ডই একেবারে শান্ত, স্থির। অকৃতকার্য হলে তাঁদেরই ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশী, তবু সারাক্ষণ তাঁরাই সকলের চেয়ে নির্লিপ্ত হয়ে রইলেন। বেলা দুপুর হল, আর সেই মুহূর্তে সমুদ্র থেকে একটি তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। ছেঁড়া তারটি সবেগে উপরে উঠে এল। কয়েকজন নাবিক ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল,

দু'জন গুরুতররূপে আহত হল। ডেকে আছড়াতে লাগল তারটা।

এরপরে সবাই একেবারে চুপ করে গেল। আর আঁকশি টানবার তার নেই, কাজেই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল কেবল্‌টি। গুচ এবং ফিল্ড একটু আলোচনার পরে কেবল্‌টি ফেলে রেখে ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়া স্থির করলেন।

ফিরতি পথে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায় গ্রেট ইস্টার্ণ গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হল। দু'সপ্তাহ ধরে ভ্যালেনশিয়া দ্বীপের স্টেশন এদের কাছ থেকে কোন সংবাদই পায়নি। গ্রেট ইস্টার্ণ লোকজন যন্ত্রপাতিসহ ঝড়ে ডুবে গেছে, এই সংবাদ দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। অনেকে বলতে শুরু করল, ওই কেব্‌লের নাম 'ফিল্ডের বোকামি; এ কেবল্‌ অভিশপ্ত, কারণ এরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে চাইছে।'

কয়েকদিন পরে যখন সেই প্রাচীন দুর্ধর্ষ জাহাজখানা ক্রুক-হ্যাভেন পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করল তখন চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। জাহাজ বিপর্যস্ত হলেও তখন সমুদ্র-গমনোযোগী। সুদূর সমুদ্রের শ্বেতহস্তীকে প্রকৃত বীরের মত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হল।

কয়েকমাস ধরে অদম্য ফিল্ড ও চতুর গুচ এ্যাংলো-আমেরিকান টেলিগ্রাফ কোম্পানি নামে একটি নতুন কোম্পানি গঠন ও ত্রিশ লক্ষ ডলারের মত মূলধন সংগ্রহের কাজে দিনের সমস্ত সময় ব্যয় করতে লাগলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন পথে মহাদেশ থেকে মহাদেশ পর্যন্ত নতুন কেবল্‌ স্থাপন করা। ইতোমধ্যে গুচের কোম্পানি এক নতুন ধরনের কেবল্‌ প্রস্তুত করছিল।

নতুন অভিযানের জন্য সজ্জিত করা হল গ্রেট ইস্টার্ণকে। তার লৌহ-ট্যাঙ্কে ২৫০০ মাইলের মত কেবল্‌ সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা হল। অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত নাবিকদের কর্মে নিযুক্ত করা হল এবার। তারপর এই বৃহৎ জাহাজ দূরবিস্তৃত আটলান্টিকের বক্ষে এগিয়ে চললো, পেছনে ছেড়ে ছেড়ে চললো নতুন নির্দোষ কেবল্‌। তার পূর্বপ্রান্ত

ভ্যালেন্‌শিয়া দ্বীপের টার্মিন্যাল স্টেশনে প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গে নিপুণভাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ইতঃপূর্বেই।

আবহাওয়া নির্মল, সমুদ্র শান্ত, মসৃণ। যে কোন জাহাজের পক্ষে এমন নির্বিঘ্নে যাত্রা কামনার বিষয়। দিনের পর দিন কেটে গেল, মাইলের পর মাইল কেবল্‌ খুলে নেমে গেল গভীর সমুদ্রতলে। নির্ভুল ঘড়ির মত স্বচ্ছন্দে জাহাজে সব কাজ চললো। ভ্যালেনশিয়ার সঙ্গে টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ রইল অব্যাহত। একবার এক ঝাঁক তিমি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। এদের যে কোন একটি তার বিরাট লেজের ঝাপটায় কেবল্‌টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারতো।

ছয়দিনের দিন তীব্র বাতাস উঠে সমুদ্রকে খানিকটা ক্ষেপিয়ে তুললো। জাহাজের দোলানিতে কেব্‌লে টান পড়লো জোর। দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে বিপদ এড়ান হল, কোন ক্ষতি হল না।

আবার চমৎকার আবহাওয়া দেখা দিল। জাহাজের বেগ বাড়িয়ে দশ নট করা হল। ট্যাঙ্ক থেকে খুলে আসার সময় কেব্‌লের ঘড়ঘড় আর যন্ত্রপাতির একটানা ঝনঝন শব্দ না থাকলে মনে করা যেত যাত্রীরা সবাই প্রমোদ ভ্রমণে চলেছে। এবারকার কেবল্‌ স্থাপনে একটিও বিপত্তিকর ঘটনা ঘটেনি। জাহাজের সঙ্গে আয়ার-ল্যাণ্ডের টার্মিন্যাল স্টেশনের অবিরাম যোগাযোগ রাখা হল।

যাত্রার চতুর্দশ দিনে ভূমি দৃষ্টিগোচর হল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে 'হার্টস কনটেন্ট' নামক গ্রামের অদূরে নোঙর ফেলে বিশ্রাম করতে লাগল।

জাহাজের মধ্যে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। দূরত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ জয়ী হয়েছে।

পরদিন সকালে উৎসব ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। মাছধরা জাহাজে করে তারের পশ্চিম প্রান্ত তীরে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর, কয়েক বছর পূর্বে ফিল্ড মূল ভূভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে সমুদ্রতলায় যে কেবল্‌ স্থাপন করেছিলেন এটাও তার সঙ্গে যুক্ত করা হল।

এই নতুন আটলান্টিকীয় কেবল্ স্থাপনের সংবাদ ইউরোপে ও আমেরিকায় বিঘোষিত হল। আমেরিকান ও ইউরোপীর বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে বাজারদর মহাদেশে মহাদেশে প্রচারিত হতে লাগল। ফিল্ড এবং গুচ অজস্র অভিনন্দনজ্ঞাপক টেলিগ্রাফ পেলেন। প্রথম সন্ধ্যার ব্যবসায়ে কেবল্ থেকে মাশুল আদায় হল পাঁচ হাজার ডলার।

প্রচুর প্রশংসা পেলেন ফিল্ড, কিন্তু উল্লসিত হলেন না। তাঁর কাছে এই কেবল্ প্রতিষ্ঠা একটা কাজ শেষ হল বলে মনে হল। তিনি প্রথম বারের কেবল্টি সমুদ্রতল থেকে উদ্ধার করতে অসমর্থ হওয়ায় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে ক্ষতি পূরণ করে উঠতে পারেননি তিনি। অল্প লোকেই একথা জানতো। জাহাজের পর্যবেক্ষণ কর্মচারী তাঁকে এক টুকরা কাগজ দিয়েছিল, সেইটা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন তিনি তখন। কেব্‌লের প্রান্ত সমুদ্রে যেখানে ডুবে আছে সেখানে একটি লাল রঙের বয়া ভাসিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ কাগজটুকুতে সেই স্থানের সঠিক অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উল্লেখ করা হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় গুণমুগ্ধ একদল ইঞ্জিনিয়ার তাঁকে প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে কি যেন এক অস্বস্তি, তাঁর মন যেন উৎসব ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে পড়ে রয়েছে। হঠাৎ উঠে তিনি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে মাপ করতে হবে। একটি জরুরী কাজে এখনি না গেলে নয়। নমস্কার!' তিনি বেরিয়ে গেলেন। উদ্যোক্তাদের একজন মন্তব্য করল, 'বাজি রাখতে পারি আমি, বড় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে আবার।'

আর ঘটলও তাই। পরদিন সকালেই ফিল্ড হারানো কেবল্ খুঁজে বার করার অভিযানের জন্য গ্রেট ইস্টার্ণ জাহাজখানাকে নিযুক্ত করলেন। তিন সপ্তাহ পরে সেই প্রকাণ্ড জাহাজ আবার তার পুরানো কাজে ফিরে গেল। সমুদ্রতলে শত শত বর্গ মাইল স্থান আঁচড়ে

বেড়াতে লাগল সে, যদিও সেটা খুঁজে পাওয়ার আশা অতি সামান্য। আটলান্টিকের তলদেশে অনুসন্ধান করে এক ইঞ্চি মাত্র মোটা এক-গাছা সরু তার উদ্ধার করার চেয়ে খড়ের গাদা থেকে সূচ খুঁজে বার করা অনেক সহজ।

চল্লিশ বার চেষ্টা করার পরে এবং শত শত মাইল স্থান খোঁজা হলে আঁকশিতে কী যেন বাধল। কেউ জানে না সেটা কী হতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঁকশি বাধা তার টেনে তোলার পরে জলজ উদ্ভিদ ও শামুক জড়ানো কী একটি বস্তু ভেসে উঠলো জলের উপরে। জাহাজের রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে ফিল্ড বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের কেবল্ই ওটা, সাবধানে নাড়াচাড়া কর।'

ওটার গা থেকে সব নোংরা জঙ্গল সরিয়ে দেখা গেল কেবল্টি বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। জাহাজে যে কেবল্ নেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে জোড়া দিয়ে আবার সেটিকে সমুদ্রতলে নামিয়ে দেওয়া হল। অতি সাবধানে চলতে শুরু করল জাহাজ এবার হাজার মাইল দূরবর্তী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড অভিমুখে।

এবার ভাগ্য সদয় ছিল ফিল্ডের প্রতি। আকাশ নির্মল, সমুদ্রও শান্ত—আবহাওয়া একদিনও বদলাল না। কেবল্ সমুদ্রে পড়বার সময় একটুও আলোড়ন দেখা গেল না সমুদ্রে। ষষ্ঠ রাত্রিতে পর্যবেক্ষক বলল, 'আলো দেখা যাচ্ছে।' যে নাবিকেরা কেবল্ নিয়ে কাজ করছিল, তারা আনন্দধ্বনি করে উঠলো। যাত্রা শেষ হয়ে এল। অন্ধকার দিগন্তশায়ী 'হার্টস কনটেন্টের' আলোগুলি ক্রমশ উজ্জ্বলতর হতে লাগল।

সকালবেলা জাহাজ নোঙর করল গভীর জলে। দুপুরের মধ্যে কেব্লের পশ্চিম প্রান্ত তীরভূমিতে রিলে স্টেশনে সংযুক্ত হল। দুটি কেব্লের দ্বারা এবার পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে যোগাযোগ স্থাপিত হল।

কেব্লের মাধ্যমে আয়ারল্যাণ্ডের টার্মিন্যাল স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হওয়া মাত্রই ফিল্ড বার্তা পাঠালো, নতুন কেবল্ ঠিক

মত কাজ করছে কিনা। উত্তর এল 'দুটি কেবলই ঠিক আছে, বেশ জোর ও সুস্পষ্ট সঙ্কেত শোনা যাচ্ছে।' অপারেটর যখন এক টুকরা কাগজে লেখা জবাবটি তাঁর হাতে দিল, ফিল্ড নীরবে সেটা পড়লেন। একটু কাঁপছিল তাঁর হাত। মৃদু কম্পিত কণ্ঠে প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের কাজ শেষ হল।'

প্রথম দুটি আটলান্টিক কেবল্‌ স্থাপনের কাহিনী গ্রেট ইস্টার্ণ সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে সমাপ্ত হতে পারে না। এই জাহাজটির আকার এবং মালবহন ক্ষমতার জন্যই একাজে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয়েছিল। কেবল্‌ স্থাপনে তার জগৎজোড়া খ্যাতি সাইরাস ফিল্ডের নামের সঙ্গেও যুক্ত।

জাহাজটি যখন কেবল্‌ স্থাপনে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, সেই সময় একটি তরুণ সাংবাদিক ইউরোপীয় সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিলেন। নবাবিষ্কৃত টেলিগ্রাফে এবং বার্তা-বাহক কবুতরের সাহায্যে সংবাদ পাঠাতেন তিনি।

পল রয়টার ছিলেন একজন ইহুদী পণ্ডিতের পুত্র। তাঁর জন্ম হয় জার্মানীতে। ব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে সাংবাদিকতার বৃত্তি যখন গ্রহণ করেন তিনি, তখনও রয়টার তরুণ যুবক মাত্র। ইউরোপীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির তখন শৈশবকাল; তারা রয়টারকে বিস্ময়কর শিশু বলে অভিহিত করতো। তিনি মুদ্রার ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের ওঠাপড়ার সংবাদ টেলিগ্রাফ করতেন, খবর দিতেন দৈনন্দিন রাজ-নৈতিক ও কূটনৈতিক হালচাল সম্বন্ধে। অস্থির পশ্চিম ইউরোপের বিদ্রোহের আয়োজন বা আসল বিদ্রোহের সংবাদ সংগ্রহ করে তিনি তৎকালীন সংবাদ সরবরাহকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছেন।

সাফল্যই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে তুললো। আমেরিকার লোকসংখ্যা তখন দ্রুত বেড়ে চলেছে। সেখানে টেলিগ্রাফে ইউ-রোপের সংবাদ পাঠালে তার বাজার পাওয়া যাবে তা বেশ বোঝা

যাচ্ছে। তাঁর অভ্যস্ত কর্মতৎপরতার সঙ্গে তিনি ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কেবল্ পরিচালনার ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী সুবিধা প্রার্থনা করে এক দরখাস্ত পেশ করলেন। তিনি স্থির করেছিলেন এ্যাংলো-আমেরিকান টেলিগ্রাফ কোম্পানির সহযোগিতায় কাজ করবেন। ফ্রান্সের সরকারী মহলে প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধব থাকাতে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

কেবল্ স্থাপনের সময়ে ফিল্ড যে সব সমস্যা ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন রয়টার তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ বুঝে ছিলেন যে একমাত্র গ্রেট ইস্টার্ণেরই মহাসামুদ্রিক কেবল্ স্থাপনের ক্ষমতা ও সুবিধা আছে।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ফিল্ডের দ্বিতীয় কেবল্ স্থাপন শেষ হওয়ার পরে গ্রেট ইষ্টার্ণের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার পূর্ব গৌরবও অক্ষুণ্ণ নেই। একটি ফরাসী সিণ্ডিকেটের ভাড়াটে জাহাজ হিসেবে তাকে আগেকার মত যাত্রীবাহী জাহাজরূপে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু যাত্রীরা কিছুতেই এ জাহাজে উঠতে চাইতো না, কাজেই আবার তার দুর্দিন ফিরে এসেছে।

গ্রেট ইষ্টার্ণের গায়ে তখনও সোনালি পাতের চাকচিক্য। নিরন্তর ভাগ্য পরিবর্তন হতে থাকে বিরাট জাহাজখানার। একজন সেটাকে ভাসমান পানশালা ও জুয়ার আড্ডা গোছের করে তুললো। পরে আর একজন সেটাকে করে তুললো একটা প্রদর্শনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য প্রদর্শন করতো যেখানে। আবার একজন সেটাকে একটাসস্তার শুঁড়িখানায় রূপান্তরিত করল। জাহাজখানাকে দেখলে মনে হ'ত ভাসমান কনি আইল্যাণ্ড। তারপর একজন উৎসাহী ব্যবসায়ী সেখানাকে ভাড়া নিয়ে তাতে বিরাট একটা কাপড়ের দোকান সাজালেন এবং বন্দরে বন্দরে ঘুরে ব্যবসা করতে লাগলেন। জাহাজখানির গায়ে দোতলা সমান উঁচু হরফে ব্যবসায়ীটির নাম লেখা ছিল। এই অবস্থায় রয়টার জাহাজখানির সন্ধান পেলেন।

গুচ কিন্তু তখনও এই জাহাজের মালিক। শীঘ্রই রয়টারের নবগঠিত ফ্রেঞ্চ আটলান্টিক কেবল্ কোম্পানি ও গুচের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। শ্রমিকেরা কাজ শুরু করে দিল। আবার বড় বড় লৌহনির্মিত ট্যাঙ্ক স্থাপিত হল জাহাজে—৩০০০ মাইল কেব্‌লের জায়গা হওয়া চাই তো।

গ্রেট ইস্টার্ণ আবার কাজের উপযুক্ত হল, দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল সে। টেমস্ থেকে বেরিয়ে চলে এল সে কেব্‌লের পূর্বপ্রান্তীয় স্টেশন ফ্রান্সের ব্রেস্টে। সেখান থেকে আটলান্টিক পার হয়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের অদূরে সেণ্ট পিয়ের দ্বীপ পর্যন্ত চব্বিশ দিনের সমুদ্র ভ্রমণে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটেনি এবার। সাময়িক এক আধটু ঝাপ্টা ছাড়া আবহাওয়া ছিল চমৎকার, সমুদ্রও ছিল নিস্তরঙ্গ।

নিরাপদে সেণ্ট পিয়ের দ্বীপে নামানো হল কেবল্‌টি। তারপর ম্যাসাচুসেট্‌স্ উপকূলের গ্রাম ডাক্সবেরি থেকে সম্প্রসারিত কেব্‌লের সঙ্গে তাকে জোড়া লাগানো হল। তার-সংযোগের চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরেই ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ আদান-প্রাদান হতে লাগল। মহাসমুদ্রের দুইধারের সব সংবাদপত্রই একবাক্যে অভিনন্দন জানালো রয়টারকে; তারা বলল, মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পরে এই কেবল্‌ই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম দান।

গ্রেট ইস্টার্ণও সেই প্রশংসার নির্ধারিত অংশ পেল। তার বিশাল আকার, শক্তি ও মালবহনের যোগ্যতা ছাড়া কেবল্ স্থাপন করে আটলান্টিকের দুই তীর যুক্ত করার কাজে হয়তো কোনদিনই সাফল্য লাভ করা যেত না।

রয়টারের কেবল্ স্থাপনের যখন শুধু আলাপ-আলোচনা চলছে, ব্রিটেন কিন্তু তার শিথিল-গ্রথিত সাম্রাজ্য নিয়ে তখনই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দূরস্থিত সব বিচ্ছিন্ন অধিকারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল একান্ত সাধারণ ও দক্ষতাহীন। কিছু বিশৃঙ্খল সামুদ্রিক কেবল্

এবং কয়েকটি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্থল টেলিগ্রাফের সাহায্যে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ আদান-প্রদান হতে লাগতো এক সপ্তাহ।

ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের জন্য যদিচ ব্রিটিশের নিজস্ব সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন ছিল, তথাপি কিন্তু কৃপণ পার্লিয়ামেণ্ট এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইল না। যে কোন লাভজনক উদ্যোগের জন্য সতত প্রস্তুত ছিলেন গুচ; তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় কেবল্ স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। তাঁর কেবল্-উৎপাদক কোম্পানি প্রয়োজনীয় সাত হাজার মাইল কেবল্ সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল। তাছাড়া এই বৃহৎ অভিযানের একমাত্র উপযুক্ত জাহাজ গ্রেট ইস্টার্নেরও মালিক তিনি। তাঁর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ কোম্পানি গঠিত হল, মূলধন নির্ধারিত হল দশ লক্ষ পাউণ্ড—তৎকালে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের সমান,—এর অধিকাংশই দিলেন গুচ নিজে। সেই প্রকাণ্ড জাহাজ আবার নতুন অভিযানের জন্য সজ্জিত করা হল, দীর্ঘ ভ্রমণের উপযোগী মালপত্রও তোলা হল। টেমস্ নদী দিয়ে যখন সে বেরিয়ে এল, দুই তীরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষ তাকে অভিনন্দন জানালো, প্রার্থনা জানালো, তার যাত্রা নির্ভয় হোক, মঙ্গলময় হোক।

প্রায় তিনমাস পরে ভ্রমণক্লান্ত জাহাজ এসে বোম্বাইতে পেঁ ছিল। তার এই আগমনকে ভারতের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে অভিনন্দন জানালো সবাই। কয়েকদিন ধরে স্থানীয় দর্শকেরা তার ডেকে বিনা বাধায় বেড়িয়ে বেড়ালো। নাবিকেরা সবাই শহরে বীরের ন্যায় অভিনন্দিত হল। জাহাজের অফিসারগণ ও কোম্পানির প্রতিনিধিগণ প্রতিভোজে আপ্যায়িত হল। আনন্দোৎসব শেষ হলে জাহাজের খোলে দশ হাজার টন কয়লা বোঝাই করা হল। তারপর তীরের টার্মিন্যাল স্টেশন থেকে কেবল্ এনে তার সঙ্গে জাহাজের কেবলের প্রান্ত জোড়া লাগানো হল। পরদিন ভরা জোয়ারের সময় সমুদ্রে

বেরুল জাহাজ—তারপর পেছনে কেব্‌ল ছেড়ে ছেড়ে এগিয়ে চলল।

কয়েকখানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাহাজের সহযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে কেবল্ স্থাপন সমাপ্ত হল ; লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হল এই কেবল্।

কাজ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন এই পুরানো সুন্দর জাহাজখানা আবার শ্বেতহস্তী হয়ে দাঁড়াল। মালিকদের আর তাকে দিয়ে কোন প্রয়োজন না থাকাতে তাকে বিক্রীর ব্যবস্থা করল। তার আকার অত্যন্ত বৃহৎ, চালানোতে প্রচুর খরচ—কাজেই কোন ক্রেতা পাওয়া গেল না। গুচের তখনও আশা ছিল তাকে হয়তো কয়লাটানা বা অন্য মালটানা জাহাজ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। কাজেই তাকে শীয়ারনেস থেকে সরিয়ে ওয়েল্‌সে মিলফোর্ড হ্যাভেন বন্দরে এনে রাখা হল। কয়েক বছর সেইখানে অকেজো হয়ে পড়ে রইল সে। বিরাট দেহ নিয়ে বহু জায়গা জুড়ে থাকাতে নৌকাচালনায় অসুবিধা হতে লাগল। ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় বন্দরের পক্ষে দৃষ্টিকটু হয়ে উঠলো সে। শহরের কর্তৃপক্ষ তাকে সরিয়ে নেওয়ার বা ধ্বংস করে ফেলার জন্য কোর্টে দরখাস্ত করল।

বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র টাঙাবার কাজে ব্যবহারের জন্য কিনে আনা হল তাকে লিভারপুল বন্দরে। এখানে তার অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। নানা রনের বাজে জিনিসের প্রদর্শনী বসলো তার ডেকে ; খেলো সস্তা চটকদার্ জিনিস বিক্রয়ের আড্ডা হল সে।

তারপর শীত এগিয়ে এল। এককালের গর্বিত জাহাজে যে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমেছিল তারা ক্রমে ক্রমে সরে গেল ওখান থেকে। গতিশীল জাহাজের আরোহীরাও তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতো না। তারপরে ভাঙ্গা জাহাজের কারবারী একটি প্রতিষ্ঠান কয়েক হাজার পাউণ্ড মূল্যে তাকে কিনে নিল। জাহাজটি নির্মাণে যে বহু হাজার টন ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে তা বিক্রী করে বেশ মোটা লাভ হবে—এটা তারা বুঝেছিল।

শকুনেরা যেমন মৃতপশুর দেহের মাংস ঠুকরিয়ে খায়, জাহাজ ভাঙ্গিয়েরাও তেমনিভাবে সেই বিশাল সুপ্রাচীন জাহাজখানাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলল। কয়েক মাসের মধ্যেই আর কিছু রইল না, কেবল কাদা থেকে মাথা তুলে রইল কয়েকখানা ইস্পাতের পাঁজরা। এইভাবে, যে দুঃসাহসী বীরেরা দূরত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের পরম বন্ধু গ্রেট ইস্টার্ণের জীবন সমাপ্ত হল।

১৮৭৪ সনের ২৪শে এপ্রিল রাত্রিবেলা—মার্কনিদের বিশাল বহুকক্ষ গৃহ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। বাড়ীতে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সমগ্র পরিবার আনন্দোৎসবে মত্ত; তাদের বিশাল সম্পত্তির দাসদাসীদের মধ্যেও বিত্যুৎগতিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। বোলনার উপকণ্ঠে অবস্থিত এই সুন্দর আবাসভূমিটি।

যথাসময়ে উপযুক্ত উৎসবসহকারে নবজাতকের নামকরণ হল—গুলিয়েলমো। শিশুর যখন তু-বছর বয়স তখন তু-বছরের পক্ষে উপযুক্ত দৈহিক বৃদ্ধি তার ঘটেনি, যদিও তার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। অন্য শিশুদের সঙ্গে জড়াজড়ি, দৌড়াদৌড়ি বা চেঁচামেচি সে কদাচিৎ করতো। ঐ অল্প বয়সেও তার স্বভাবে যেন চিন্তাশীলতা পরিলক্ষিত হ'ত। সে খেলনা নিয়ে খেলাধূলার পরিবর্তে সেগুলো কী করে চলে তাই অনুসন্ধান করতে ভালবাসতো। জ্ঞানার্জনের আগ্রহে সে অনেক সময়েই খেলনাগুলো ভেঙ্গে ফেলতো; দেখতো কী করে সেগুলো চলে, কেমন করে তাদের জোড়া হয়। কোন কোন সময় সে ইচ্ছা করে রৌদ্রের মধ্যে বসে থাকতো; বারান্দার মেঝের উপর তার মোটা মোটা আঙ্গুল নেড়ে-চেড়ে অপসৃয়মান ছায়াগুলি বসে বসে দেখতো। উড়ন্ত পাখি তাকে মুগ্ধ করতো; মন্ত্রমুগ্ধের মত পাখির কাকলি ও গান শুনতো সে।

স্কুলের বয়সে তার ভার দেওয়া হয়েছিল একজন গৃহশিক্ষয়িত্রীর হাতে; তাকে সে প্রশ্নে প্রশ্নে প্রায় পাগল করে তুলতো। সব কিছুর কারণ খুঁজে দেখাতে ছিল তার একান্ত আগ্রহ। লিখতে পড়তে শেখার পর সে বহুদিন একটি প্রাচীন সাইপ্রেস গাছের নিচে খোলা বই হাঁটুতে করে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। সে

মাঝে মাঝেই গিওভ্যান্নির শব্দমুখরিত কারখানা ঘরে গিয়ে হাজির হ'ত। এই লোকটি ছিল মার্কনির এস্টেটের ক্ষিপ্রহস্ত শ্রমিক ও মালী। সেখানে সে মনোযোগ সহকারে সব রকমের যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করতো, লক্ষ্য করতো কুড়ুল ও কাস্তে শান দেওয়া।

পরে ঐ কারখানাতেই দশ বছর বয়স্ক মার্কনি কাঠের বা তারের টুকিটাকি বা ধাতুর টুকরা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো, বয়স্কদের নিকট যা অপ্রয়োজনীয় তেমনি সব জিনিস তৈরি করতো। এই সব আরম্ভ থেকে বোঝা যেত যে বালকটির মন সক্রিয়, স্বাভাবিক আবিষ্কার প্রবণতা রয়েছে তার। তের বছর বয়সেই যন্ত্রপাতির ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠলো সে। প্রকাণ্ড বাড়ীর একটি অব্যবহার্য কক্ষে সে নিজেই একটি কারখানা খুলে বসল। এই কক্ষে সে কয়েকটি বেশ রহস্যময় লেবরেটরী যন্ত্র স্থাপন করেছিল।

প্রায় ঐ একই সময়ে সে শুনতে পেয়েছিল যে হেনরিখ হারৎস্ নামক একজন জার্মান পদার্থবিদ্ বলেছেন যে ইথার তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বহন করতে পারে। তার তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য হারৎস্ একটি আবেশকুণ্ডলীর সাহায্যে একটি বৃহৎ কক্ষের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলেন। প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে ভেতরে ক্ষুদ্র ফাঁকওয়ালা একটি তারের আঙটি বসানো হল। হারৎস্ যতবার সুইচ টানলেন ততবারই একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ দূরবর্তী আঙটির ফাঁকের মধ্যে দেখা দিল। আঙটি ও কুণ্ডলীর মধ্যে ইথার ছাড়া আর কোন পরিবাহক ছিল না।

হারৎসের এই পরীক্ষার সংবাদ বালক মার্কনির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। সে তার স্কুলের কাজের ক্ষতি করেও দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ধরে এই বিষয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করে কাটাতে লাগল। অল্প বয়সেই সে জানতে পারলো যে ইথারের মৌলিক উপাদান কী, এ বিষয়ে কেউই সঠিক কিছু জানে না। মানুষ শুধু জানে এটি সমস্ত শূন্যস্থানব্যাপী এক অদৃশ্য, গন্ধহীন, স্বাদহীন পদার্থ।

ইথার সর্বব্যাপী, এমন কি বায়ুশূন্য স্থানেও এ আছে। এর তরঙ্গ কঠিন ও তরল পদার্থ ভেদ করে অগ্রসর হয়, যেন এদের কোন অস্তিত্বই নেই। উচ্চতম পর্বত বা গভীরতম সমুদ্র এর উন্মত্ত প্রবাহ রোধ করতে পারে না। কিন্তু ইথার কী, কেউ জানে না।

যত গভীরভাবে সে এই বিষয়ে নিমগ্ন হতে লাগল, ততই তার হতাশাও বাড়তে লাগল। সে এত কৃশ ও অস্থির হয়ে উঠলো যে তার পিতামাতা তাকে লেগহর্ণে এক স্কুলে পাঠানো স্থির করল। সেখানে এই পরিবারের এক অধ্যাপক বন্ধু তার দায়িত্ব নিতে স্বীকার করল। পরিবেশের পরিবর্তনেও বিজ্ঞানের প্রতি মার্কনির আগ্রহ ও ঝোঁক একটুও কমলো না। ওখানে কয়েকটি মাস তার কোন উপকারে লাগল না। তারপরে তাকে বোলগানাতে পাঠানো হল অধ্যাপক রিঘির সহকারী করে। সে সময়ের যে একদল বৈজ্ঞানিক ইথারকে সঙ্কেত প্রেরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিলেন, রিঘি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যদিও তাঁরা তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন, তথাপি তাঁরা সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

মার্কনির বয়স তখনও বিশের নিচে। অধ্যাপক রিঘির অজ্ঞাতেই তিনি পিতার এস্টেটে নিজস্ব কারখানায় তাঁর নিজেরই অবসর সময়ে নির্মিত প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র স্থাপন করলেন।

তারপরে শুরু হল একনিষ্ঠ সাধনা। বিকচোন্মুখ বিজ্ঞানী তাঁর জাগরণের প্রতিটি মুহূর্ত পাঠে ও গবেষণায় কাটাতে লাগলেন। ইথারকে জয় করবার প্রথম চেষ্টা কেবলই ব্যর্থ হতে লাগল। একটির পর একটি ব্যর্থতা আসে, তিনি শৈশবে বহুবার যে প্রশ্ন করেছেন, সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন, কেন? কেন অকৃতকার্য হচ্ছেন তিনি?

বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি অনবরত পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, প্রতিবারই ভুল হচ্ছে। তাঁর সাহস কমে এনেছে তখন। একদিন তিনি গভীর রাত্রিতে পরীক্ষাগারে প্রবেশ করলেন। বেঞ্চের উপর

একটি জটিল বৈদ্যুতিক যন্ত্র সজ্জিত ছিল ; সন্ধ্যার দিকে এই যন্ত্রে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি ওটা খুলে ফেলে আবার নতুন করে শুরু করবেন ভাবছিলেন। ওটা থেকে একটি টার্মিন্যাল বিযুক্ত করতেই কিন্তু চমকে উঠলেন তিনি, দশ ফুট দূরের গ্রাহকযন্ত্রে একটি স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে। এইটিই প্রথম বিজয়-সঙ্কেত। আবারও প্রশ্ন, কেন? জবাব খুঁজে পেতে বহুদিন কেটে গেল।

সেই স্ফুলিঙ্গ থেকে বেতারের উদ্ভাবন রূপকথার মত চিত্তাকর্ষক। ক্রমে ক্রমে প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ানো হল ; দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগল। ১৮৯৪ সনেই মার্কনি তিনশ' ফুট দূরে ডট ও ড্যাশ পাঠাতে সক্ষম হলেন। সঙ্কেত অস্পষ্ট ও দুর্বল ছিল বটে, কিন্তু বেতারে বার্তা প্রেরণের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল, বিজিত হল ইথার।

দু'বছর পরে তরুণ আবিষ্কারক প্রায় তিন মাইল দূরে ডট-ড্যাশ-বার্তা পাঠাতে সক্ষম হলেন। এক বছর পরে ইংলণ্ডের উপকূল থেকে এক জাহাজে বার্তা প্রেরণ করা হল, আর কয়েক মাসের মধ্যেই দূরত্ব বেড়ে হল চব্বিশ মাইল।

অবশ্য ১৮৯৯ সনের এপ্রিল মাসেই (তার আগে নয়) মার্কনির 'বেতার' সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করে দিল আর যারা সমুদ্রের বিঘ্ন-বিপদের মধ্যে জাহাজ চালায় তাদের নিকটে এই আবিষ্কার দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে হল। ১৮৯৯ সনেই একদিন ইংলিশ চ্যানেলে ঘন কুয়াশার মধ্যে স্টিমশিপ আর. এফ. ম্যাথুজ গুড্উইন স্যাণ্ডসের অগভীর জলে নোঙর করা লাইটশিপের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। ব্রিটিশ নৌবিভাগের দূরদর্শিতাবশত হাল্কা জাহাজখানিতে মার্কনির বেতার ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে সমুদ্রগামী হাজার হাজার জাহাজের মাত্র দু'চারখানায় এ ব্যবস্থা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে মাত্র পনর মাইল দূরবর্তী একটি বাণিজ্য-জাহাজে বেতার-ব্যবস্থা ছিল। অপারেটার

বিনা কাজেই গ্রাহকযন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সহসা মর্স কোডে ডুবন্ত জাহাজ থেকে বিপদ-সঙ্কেত শুনতে পেল। বাণিজ্যপোতটি পূর্ণবেগে সেই হতভাগ্য জাহাজের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল। যখন সব নাবিকদের তুলে নেওয়া শেষ হল, ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই জাহাজটি ভেঙ্গে ডুবে গেল সমুদ্রের অগভীর তলে।

এর একমাসের ভিতরেই ব্রিটিশ নৌবহরের দুখানা জাহাজ পঁচিশ মাইল দূর থেকে পরস্পরের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হল। ডাবলিন এক্স্‌প্রেস পত্রিকা তাৎক্ষণিক সংবাদ বিনিময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে উপকূল থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অনুষ্ঠিত কিংস্‌-টাউন বাইচের সংবাদ মিনিটে মিনিটে প্রেরণের জন্য ফ্লাইং হাণ্ট্রেস নামক স্টিমারকে নিযুক্ত করেছিল। মর্স সঙ্কেতে প্রায় পাঁচশ দফা সংবাদ পাঠিয়ে সেই বাইচ প্রতিযোগিতার বিবরণ প্রচার করেছিল তারা।

ঐ ঘটনাবহুল বৎসরের মার্চ মাসেই মার্কনি ফ্রান্সের বুলোন থেকে বত্রিশ মাইল দূরবর্তী ইংলণ্ডের সাউথ ফোরল্যাণ্ডে বেতার বার্তা প্রেরণ করেছিলেন।

তাঁর আবিষ্কারের সীমিত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মার্কনি বৃহত্তর সাফল্যের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। উত্তর আটলাণ্টিকের এপার-ওপার কেব্‌লে সংবাদ আদান-প্রদান ছিল ধীরগতি, এবং অনেক সময় নির্ভরের অযোগ্য। বিশেষত রাত্রিবেলা অনেক সময়ই সঙ্কেত রহস্য-জনকভাবে অস্পষ্ট হয়ে পড়তো, প্রায় বোঝাই যেত না।

উত্তর আটলাণ্টিক প্রতিদ্বন্দ্বী হল এবার। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী দু'হাজার মাইলব্যাপী বিশ্বাসঘাতক মহাসমুদ্র বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল, সেই বাধা অতিক্রম করতে হবে। এ কাজ সম্ভাবনার অতীত বলে মনে হল সকলের। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিষয়টি অনুধাবন করতে লাগলেন মার্কনি, তারপর তাঁর সূক্ষ্ম আবিষ্কার প্রতিভা নিয়ে কাজ শুরু করলেন। ইথারের অস্পষ্টতম কম্পনও গ্রহণ

করতে পারে এমন একটি সুবেদী ডিটেক্টর নিয়ে কাজ করতে লাগলেন তিনি। তাঁর স্বদেশ ইটালীতে কাজের সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে এলেন। তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে ঐ ডিটেক্টরের উপর, ঐটি নির্মাণ করাই এখন আসল কথা। ডিটেক্টর নির্মাণ শেষ হল ; সুকঠিন পরীক্ষায় দেখা গেল যন্ত্রটি আশানুরূপই হয়েছে।

ইতোমধ্যে কর্ণওয়ালের উপকূলে পোলধু (Poldhu) গ্রামে অতি দ্রুত একটি শক্তিশালী প্রেরক স্টেশন নির্মিত হচ্ছিল। গ্রামটির ছোট ছোট একতলা দালানের উপর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল কয়েক শত ফুট মাস্তুলে তৈরি, বহু মাইল তামার তার জড়ানো চোঙের মত একটি খাঁচা। নিচু নিচু সব দালানের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হল। এখানে উৎপাদিত বিদ্যুতে একটি সমগ্র শহর আলোকিত করা চলতো। বিদ্যুতের ভোল্টেজ ছিল খুব বেশী, কাজেই বিপদের সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর। তাই অপারেটরগণ সমুদ্রের উপর দিয়ে সঙ্কেত প্রেরণের জন্য সাধারণ টেলিগ্রাফ চাবি ব্যবহার না করে তিন ফুট একটি কাঠের হাতল ব্যবহার করতো। স্থানটি নরকের মত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। মনুষ্য-সৃষ্ট সশব্দ কম্পিত বিদ্যুৎশিখা বড় বড় লেডেন জারের গাঁট থেকে গাঁটে প্রবাহিত হয়ে চলতো। ওজোনের তিক্ত মধুর গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সঙ্কেতটি ছিল কিছুক্ষণ পরে পরে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত প্রবাহ দ্বারা সূচিত মর্স কোর্ডের S অক্ষর।

আটলান্টিকের অপর পারে (১৯০১ সনের এপ্রিল মাসে) নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সেণ্টজন পোতাশ্রয়ের উপরে সিগন্যাল হিলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দালানে তিনজন লোক মুখোমুখি হয়ে বসে ছিল। তীব্র ঠাণ্ডা পড়েছে সেদিন। মেরুদেশীয় ঝড় সেই গৃহের জানালায় এসে আছড়ে পড়ছে, খড়খড়ি দিয়ে শোঁ শোঁ করে ভিতরে ঢুকছে। ছাতের চারশ'ফুট উঁচুতে একটি বিরাট ঘুড়ির সঙ্গে একটি সরু তারের

এরিয়েল ঝুলান আছে। তারটি এনে সংযুক্ত করা হয়েছে টেবিলের উপর সাজানো কয়েকটি অদ্ভুত যন্ত্রের সঙ্গে।

তাঁদের মধ্যে মার্কনির বয়স সবচেয়ে কম। তিনি শঙ্কিত চিত্তে তাঁর অতিসুবেদী ডিটেক্টরটি ঠিক-ঠাক করে নিচ্ছিলেন। কানের হেডফোন যেন তাঁর মুখের বিবর্ণতা ও কালো ইতালীয় চোখের প্রত্যাশার উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এক ঘন্টা কেটে গেল, সবাই নীরব। দেওয়ালে একটি ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে। ঠিক ১২-৩০ বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ আবিষ্কারক সামনে ঝুঁকে পড়লেন। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। তারপর যেন বিদ্যুতাহত হয়ে তাঁর দেহ শক্ত হয়ে গেল। হেডফোনের মধ্য দিয়ে শোনা গেল তিনটি অস্পষ্ট শব্দ—বারে বারে একেক সেকেণ্ড পর পর সেই শব্দ পুনরাবৃত্ত বল—"ডিট্-ডিট্-ডিট্,"—"ডিট-ডিট-ডিট।" দুই হাজার মাইল দূরস্থিত পোলধু থেকে ঝটিকামথিত সমুদ্র পার হয়ে পাখা মেলে আলোকের বেগে উড়ে আসছে মর্সের সঙ্কেতে পূর্বনির্দিষ্ট S অক্ষরটি। কয়েক মিনিট মুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই শব্দ শুনলেন মার্কনি, তারপর হেডফোন খুলে নিলেন।

'এই নাও কেম্প, এটা নাও,' তাঁর এক সহকারীকে বললেন তিনি। কেম্প ভীরু পাখির মত কম্পিত অবস্থায় হেডফোন লাগিয়ে কান পেতে রইলেন। একই সঙ্কেত ভেসে আসছে বারে বারে।

'তুমি জিতে গেলে মার্কনি,' কেম্প বললেন, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি, এ ঘটা সম্ভব।'

বহুমাসের অস্বস্তি ও উদ্বেগের অবসান ঘটেছে। তিনজন তরুণ তীব্র শীত ও বাইরের দুর্দাম ঝড়ের মত্ততা অগ্রাহ্য করে আনন্দে হেসে, নেচে চীৎকার করে সারা বাড়ী মুখর করে তুললেন। দীর্ঘদূরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেই রাত্রি থেকে নতুন যুগের সূচনা হল।

মার্কনির এই বিজয়বার্তা দাবানলের মত পৃথিবীর প্রান্ত থেকে

প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ সহজেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হল। যদি একটি অক্ষর S-কে ইথারের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে সমুদ্রের ওপারে প্রেরণ করা সম্ভব হয়, তবে বর্ণমালার অন্যান্য অক্ষরও এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রেরণ করা চলবে।

ইংলণ্ড থেকে এই তিনটি ডটের প্রেরিত বার্তা হল মাত্র আরম্ভ; বিরাট আসল কাজ তখনও বাকী রয়েছে। বেতারকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলবার চেষ্টা চললো দিনে রাতে। অনেক বেশী শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্র, আরও বেশী সুবেদী ডিটেক্টর সব নির্মিত ও স্থাপিত হল। ক্রমে ক্রমে সঙ্কেত শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট হল। সহজ সহজ শব্দ সব প্রেরিত ও গৃহিত হল কিছুদিন। শীঘ্রই পুরো বাক্য প্রেরণ করা হল; তারপর ইথারে ভর করে আলোকের বেগে উড়ে এল দীর্ঘ সুসংবদ্ধ সংবাদ। বাণিজ্যিক তথা বৈজ্ঞানিক সাফল্য, মনে হল একই সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। ইংলণ্ডে পোলধুতে এবং নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডে সিগন্যাল হিলে সমুদ্রের দুই তীরে দুই স্থানে কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনার অন্ত নেই।

তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে রুক্ষ চেহারার দুজন মানুষ এসে পেঁাছল সিগন্যাল হিলে। তারা সরকারী কাজে সিনর মার্কনির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বলে জানালো। গবেষণা-গৃহে যেখানে মার্কনি হেডফোন পরে টেবিলে ছড়ানো যন্ত্রপাতির মধ্যে বসেছিল, তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। একটিও কথা না বলে তাদের একজন পকেট থেকে একটি দলিল বার করে মার্কনির সামনে ঠেলে দিল।

ওটা নিশ্চয়ই আইন-সংক্রান্ত কোন কাগজ। পড়তে পড়তে তার মুখ একটু ম্লান হয়ে গেল। তাঁর চওড়া কপালে একটু কুঞ্চন জেগে উঠলো। এ্যাংলো আমেরিকান কেবল কোম্পানির আন্তর্মহাদেশ যোগাযোগে সরকার-স্বীকৃত একচেটিয়া অধিকার ছিল; তারাই

নোটিশ দিচ্ছে, মার্কনিকে তাঁর যন্ত্রপাতিসহ অবিলম্বে নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড থেকে উঠে যেতে হবে। কাগজখানি পড়ে ভাঁজ করে এক-পাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ধন্যবাদ আপনাদের, নমস্কার।'

সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর ছিল। তিনি বুঝলেন, এই সব সূক্ষ্ম যন্ত্র-পাতিসহ তাঁর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের এলাকার বাইরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনুসন্ধান করে জানা গেল ওখান থেকে প্রায় তিনশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নোভা স্কোটিয়ার এলাকায় গ্লেস বে-তে কেপ ব্রিটন দ্বীপে একটি সুবিধাজনক স্থান আছে।

যন্ত্রপাতি এবং অন্য সব সাজসজ্জা অনতিবিলম্বে খুলে ফেলা হল। তারপরে সব কিছু চাপিয়ে দেওয়া হল একখানি ভাড়াটে স্টিম ট্রলারের ডেকে। ওরা সব কিছু গ্লেস বে-তে নির্দিষ্ট স্থানটিতে নিয়ে গেল।

আবার কাজ শুরু করার আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে গুরুতর, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি গেল। যন্ত্রপাতি চালু করার পরে মার্কনি ইউরোপে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য, ফিরবার পথে পোলধু থেকে প্রেরিত সঙ্কেতের শক্তি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি তাঁর প্রথম শ্রেণীর স্টিমশিপ ফিলাডেলফিয়ার কেবিনে অতিসুবেদী গ্রাহকযন্ত্র বসিয়ে নিলেন। জাহাজ যখন পশ্চিমদিকে তার যাত্রাপথে এগিয়ে চললো, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে কিছুক্ষণ পরে পরেই গৃহীত সঙ্কেতের সুস্পষ্টতা ও শক্তি পরীক্ষা করতে লাগলেন। ১,৫৫১ মাইলেও প্রেরিত বার্তা বেশ সুস্পষ্টরূপে চলে এল, কিন্তু ২০৯৯ মাইলে সঙ্কেতে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিল। মার্কনি বুঝতে পারলেন তাঁর আকৈশোরের স্বপ্ন এতদিনে সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে। গ্লেস বে ও পোলধুতে প্রেরণ ও গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকায় আটলান্টি-কের এপারে ওপারে বার্তা প্রেরণ নিশ্চিত হয়ে উঠলো।

১৯০২ সনের ২১ শে ডিসেম্বর গ্লেস বে থেকে মাস্তুল নিয়ে প্রথম আটলান্টিকের এপারে রেডিওগ্রাম প্রেরণ করা হল। তারপর

সাফল্যের পর সাফল্য এল। এক বছরের মধ্যে মার্কনি কেপ কডে ওয়েলফ্লিটে একটি সুসজ্জিত উচ্চশক্তি স্টেশন স্থাপন করলেন। প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেণ্ট কর্তৃক ইংলণ্ডের নৃপতি সপ্তম এড-ওয়ার্ডের নিকট প্রেরিত অভিনন্দনই হল প্রথম সরকারী বার্তা।

বিজ্ঞানের দিক থেকে এবং বাণিজ্যের দিক থেকেও বেতার তত-দিনে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। শিল্প হিসেবে এর তখনও বিশেষ উন্নতি হয়নি। তখনও প্রচুর কাজ বাকী রয়েছে। মার্কনি ক্রমাগত পরীক্ষা উদ্ভাবন করে চললেন; ক্রমশ রেডিওগ্রাফির (তিনিই এ নাম দিয়েছিলেন) উন্নতি হতে লাগল। ইথার তরঙ্গের গঠন ও ছক এবং যে বৈদ্যুতিক শক্তি এদের সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে এদের সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণা করে তাঁর সময় কেটে চললো।

১৯০৬ সনে তিনি 'নির্বদ্ধ তরঙ্গ-তন্ত্র' উদ্ভাবন করেন। এর দ্বারা প্রেরণ যন্ত্র হতে নির্গত তরঙ্গ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা চলতো। তার ফলে আরও অনেক বেশী দূরে বেতার বার্তা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রেরণ করা চলতো। এক বছর পরে নোভা স্কোটিয়া এবং আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য 'মার্কনি কমার্শিয়াল ওয়্যারলেস সিস্টেম' খোলা হল। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েও মার্কনি তাঁর গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯১০ সনের মধ্যে তাঁর ডিটেক্টার আমূল পরিবর্তিত হল। এবং সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে গ্রাহকযন্ত্র নির্মিত হল। এই সব আবিষ্কারের ফলে আর্জেন্টিনাতে মার্কনি বেতার স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হল। এই স্টেশনে ৫০০০ মাইল দূর থেকে বার্তা গ্রহণ করা হ'ত।

একদিন বিকেলে তাঁর প্রায়-সমাপ্ত নতুন ডিটেক্টার নিয়ে কাজ করতে করতে তিনি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে গৃহীত সঙ্কেত সুস্পষ্ট করে তুলবার জন্য যন্ত্রে নানাবিধ অতি-সূক্ষ্ম সব পরিবর্তন করছিলেন। একান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, ঘুমে চক্ষু ভারী হয়ে এসেছে। প্রায় মধ্যরাত্রিতে তিনি লেবরেটরী থেকে উঠে গেলেন। পরদিন তিনি

তাঁর পরিশ্রমের ফল পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তাঁর দুজন সহকারী কারিগরকে ডাকলেন।

তিনি এমন একটি স্টেশনের বার্তা ধরতে চেষ্টা করলেন যেখান থেকে সাধারণত সুস্পষ্ট, শক্তিশালী সঙ্কেত পাওয়া যায়। তাঁর হেড-ফোনে তিনি একটি অস্পষ্ট ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি এখানে ওখানে যন্ত্রে সূক্ষ্ম পরিবর্তন করলেন, কিন্তু তার ফলে শুধু বিদ্যুৎ-যন্ত্রের অতি কর্কশ ধ্বনিই শোনা গেল। স্টেশনের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখা গেল সবকিছু একেবারে ঠিকঠাক আছে। কাজেই বেশ বুঝা গেল ত্রুটিটা ঐ অতি সুবেদী ডিটেক্টারেই বটে, আর ঐ ডিটেক্টার খুলে ফেলার অর্থ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কঠোর পরিশ্রম করা। মার্কনি সংগ্রাম না করে পরাজয় স্বীকার করার লোক ছিলেন না। যে যন্ত্রের পরিকল্পনা ও নির্মাণে তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন, আবার তিনি সেই যন্ত্র খুলতে শুরু করলেন।

তিনি প্রতিটি আলাদা অংশ পরীক্ষা করতে করতে এমন নিমগ্ন হয়ে গেলেন যে তাঁর আর স্থান কাল সম্বন্ধে বাহ্যজ্ঞান রইল না। সমুদ্রতীরে সাধারণত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছির উৎপাত। মাঝে মাঝে মাছি তাড়াবার জন্য তিনি থামছিলেন। একখণ্ড সূক্ষ্ম যন্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি পিনের মাথার চেয়েও বড় নয় এমন একটি বিন্দু-প্রমাণ বস্তু আবিষ্কার করলেন। ম্যাগনিফাইং কাচের নিচে পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন জিনিসটি ঐ রকম একটি অতি সূক্ষ্ম পোকা। আগের রাত্রিতে হয়তো ওটা ওর মধ্যে উড়ে গিয়ে আটকে পড়েছে; আর পড়বি তো পড় একেবারে যন্ত্রের অতিসুবেদী অংশেই পড়েছে। কৌতুহলী এক ইঁদুর যেন এক্সপ্রেস ট্রেনকে থামিয়ে দিয়েছে। ওটাকে সরিয়ে ফেলতেই আবার সুস্পষ্ট শব্দ-গ্রহণে কোন বাধা রইল না। পরবর্তী জীবনে অনেক বড় বড় কাজে যখন তিনি লিপ্ত হয়েছেন, মার্কনি ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর কাছে তাঁর আসন্ন পরাজয়ের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন নি।

সমগ্র জগৎ-জোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন তিনি গড়ে তুলছিলেন, মার্কনি তখনও তাঁর নানাবিধ পরীক্ষা ও আবিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এই সব আবিষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'ডুপ্লেক্স্' নামক একটি যন্ত্র ; এর দ্বারা একই সময়ে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যেত বিনা বাধায়।

ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের ও দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্র তাঁকে বহুবিধ সম্মানে ভূষিত করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নানা ডিগ্রী প্রদান করে। এমন কি বিখ্যাত টমাস এ. এডিসনও সরকারী ভাবে তাঁর একটি কোম্পানিতে কাজ করাকে সম্মানজনক বলে মনে করেছিলেন। যখন প্রথম মহাযুদ্ধ বাধলো মার্কনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক শুভবুদ্ধি দুইই সেই কাজে নিয়োজিত করেন। ইটালী তাঁকে বেতার বিভাগের পুরোধা হিসাবে নিয়োজিত করে, কিন্তু তিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যাপৃত সকলকেই সাগ্রহে সাহায্য করেছেন।

রেডিও আবিষ্কর্তা গুলিয়েল্মো মার্কনি সাতষট্টি বৎসর বয়সে ১৯৩৭ সনের ২০শে জুলাই রোমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রত্যেক মহৎ আবিষ্কারের পূর্বেই এমন সব ছোটখাটো বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া দেখা গেছে, ঐ বৃহৎ আবিষ্কারের সাফল্যের পক্ষে যাদের দান অনস্বীকার্য। যেমন মার্কনি কর্তৃক আটলান্টিকের ওপারে S-সঙ্কেত প্রেরণের সাতাশ বছর আগে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তাত্ত্বিক দিক থেকে ইলেক্ট্রনিক তরঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। ১৮৮০ সনে এডিসন ইলেক্ট্রিক বাল্‌বের ফিলামেণ্ট এবং কাচের বাইরে রাংতার আবরণীর মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহ আবিষ্কার করেন, যদিচ কাচ বিদ্যুৎশক্তির অপরিবাহক বলে সবাই জানতো। সেই রহস্যময় ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছিল 'এডিসন এফেক্ট'। রেডিওর আবিষ্কারে এর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারপর এলেন হেনরিখ হার্‌ৎস্; ইনি ১৮৮৬

সনে ইথার তরঙ্গের পরিবহণ ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখান। আবার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভাণ্ডারে মার্কনির দান থেকেই যে আধুনিক রেডিও উদ্ভূত হয় তা আমরা জানি। মার্কনির বেতার ছিল মুখ্যত একটি সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম। মর্সের টেলিগ্রাফের মত বেতারও বর্ণমালার অক্ষর ও সংখ্যার প্রতীক সব ডট্ ও ড্যাশ সূত্রে বার্তা বহন করে নিয়ে যেত শুধু।

সঙ্কেতগুলি সহজ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব সঙ্কেতই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহন করতো, আজও করছে। আমার এক বন্ধু হতভাগ্য এস্, এস্ টাইটানিকের যাত্রী ছিল। সে আমাকে বহুবার ১৫১৭ জন মানুষের জীবনান্ত হয়েছিল যে সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় তার বর্ণনা দিয়েছে। বেতারের অলৌকিক কৃতিত্বে যাদের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল সে ছিল তাদেরই একজন। যে বীরত্ব, ও ধৈর্য সহকারে পুরুষ ও নারীরা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল সে তার বর্ণনা করেছিল। কিন্তু জাহাজের উঁচু ডেকে বেতারযন্ত্র থেকে সমুদ্রের উপর দিয়ে যে SOS প্রেরিত হয়েছিল, উদ্ধারের জন্য চারিদিকে অনবরত যে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হচ্ছিল, তার মনের উপর সেইটাই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভীত যাত্রীরা শুনতে পাচ্ছিল "ডিট্-ডিট্-ডিট্, ডা-ডা-ডা, ডিট্-ডিট্ ডিট্।' মাঝে মাঝে SOS থামিয়ে দুর্বোধ্য ডট ও ড্যাশের ঝড় তুলে জাহাজের অবস্থান ব্রডকাস্ট করা হচ্ছিল। উপরের ডেকে একটি ভীত পাঁচ বছরের মেয়ে তার মায়ের স্কার্ট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বেতারের বারে বারে আবৃত্তি উচ্চগ্রামের শব্দ যেন তার উপর মোহ বিস্তার করছিল। তার শঙ্কিত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'মা, ও কি ভগবান?' 'হ্যাঁ, মা,' মহিলা উত্তর দিল। 'ওটা ঈশ্বরেরই করুণা বটে।' মা ও মেয়েকে টেনে লাইফবোটে তোলা হল, যাদের জীবনরক্ষা হয়েছিল তাদের মধ্যে ওরাও ছিল।

যে মুহূর্তে অন্ধকারে লুক্কায়িত ভাসমান তুষারশৈলে আহত হয়ে

তলা ফেটে গেল সেই বিরাট যাত্রীবাহী জাহাজের, তার যাত্রীদের সকল আশা কেন্দ্রীভূত হল বেতার অপারেটার জ্যাক বিনসের উপর, ক্যাপ্টেন বা নাবিকদের নিকট থেকে আর প্রত্যাশা করার কিছু ছিল না। জ্যাক বিনস্ তার যন্ত্র ছেড়ে আর ওঠেনি, জাহাজের সঙ্গে তারও সলিল-সমাধি হয়।

পরে যখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হয় তখন ভাগ্যের এক রহস্যময় বিয়োগান্ত খেলার কথা প্রকাশিত হয়। টাইটানিকের SOS দুটি স্টিমশিপ কার্পাথিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু দুটি জাহাজই ঘটনাস্থল থেকে বহু ঘণ্টার পথ দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তারা যত দ্রুতগতিতে সম্ভব এগিয়ে এসেছিল উদ্ধারের কাজে। তারা যখন পৌছল তখন শত শত লোক মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু লাইফ-বোটে করে যে সব যাত্রীরা চারিদিকে বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের তারা উদ্ধার করলো। পরবর্তী তদন্তে প্রকাশ পায় যে, আরেকখানা রেডিও সজ্জিত জাহাজ অল্প কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; তারা এই জাহাজের দুর্ভাগ্যের কথা জানতেও পারেনি। বেতারের অপারেটার কাজের শেষে যন্ত্র থেকে অল্প দূরে তার বার্থে ঘুমিয়েছিল।

ঐ সময়ে আইনের ব্যবস্থা ছিল যে, যে জাহাজ পঞ্চাশ জনের বেশী যাত্রী বহন করবে তাতে রেডিও টেলিগ্রাফ যন্ত্র স্থাপন করতে হবে, এবং একজন দক্ষ অপারেটার নিযুক্ত করতে হবে। টাইটানিক ধ্বংসের কিছুদিন পরে সেই আইন সংশোধন করা হল। একজনের স্থলে দুজন অপারেটর নিয়োগের ব্যবস্থা হল; একবার পাহারার বদলে এক-জনের পর আরেক জনের পরপর পাহারা বাধ্যতামূলক করা হল। জাহাজে এমন সাহায্যকারী বেতারযন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হল, যা জাহাজের শক্তি-সরবরাহের উপর নির্ভর না করেও চালু রাখা সম্ভব।

সমুদ্রে নিরাপত্তার ব্যাপারে এক বিরাট নাটকীয় সাফল্য এবং তজ্জনিত প্রচার-কার্যের ফলে রেডিও টেলিগ্রাফি লক্ষ লক্ষ মানুষের

কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। রাতারাতি অসংখ্য পদ্ধতির সৃষ্টি হল। হতাশ বিজ্ঞানীরা নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে সেখানে এসে জড়ো হল। ডট্ ড্যাশবার্তা গ্রহণের জন্য অতি সাধারণ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন দেখে অপেশাদার বিজ্ঞানীরাও হাজারে হাজারে রেডিও নির্মাণ শুরু করে দিল। একজোড়া ড্রাইসেল ব্যাটারী, একটি টিউনিং তার, একখণ্ড স্ফটিক বা জরুরী প্রয়োজনের সময় একটুকরা কয়লা, একখণ্ড সরু তার যার নাম 'বিড়ালের গোঁফ' এবং এক জোড়া 'ইয়ার-ফোন'—একটি গ্রাহক স্টেশন স্থাপনের জন্য এর বেশী বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। বাড়ী থেকে কোন উঁচু গাছে বা বাঁশের থামে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত তারের এরিয়্যাল।

১৯০৪ সনেই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জন ফ্লেমিং একটি সংশোধক টিউব আবিষ্কার করেন। এর নাম ছিল 'ফ্লেমিং ভাল্ভ্।' মানুষের কণ্ঠ-ধ্বনি বা অন্য প্রকার শব্দ ইথার তরঙ্গের উপর দিয়ে প্রেরণের এইটিই প্রথম প্রচেষ্টা। যাই হোক, সঠিক পথে হলেও এটি প্রথম চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এর সঙ্কেত ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট, শব্দ-বর্ধনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল তাই।

দুই বৎসরের মধ্যেই ডাঃ ডিফরেস্ট একটি তিন ইলেকট্রোডসম্পন্ন শব্দবর্ধক নল (Amplifier tube) আবিষ্কার করেন। ফলে ধ্বনির গুরুত্ববৃদ্ধির উপায় হয়। ডিফরেস্ট নল রেডিও টেলিফোনী শিল্পে উন্নতির একটি বিশেষ ধাপ বটে। তা হলেও একে অসম্পূর্ণ বলতেই হবে। আসলে বর্তমানকালে জনসাধারণ যে পরিমাণ যান্ত্রিক উন্নতির ফলে রেডিও প্রোগ্রাম উপভোগ করতে পারছে তা বহু বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রথম প্রচারিত হয় ১৯২০ সনে পিট্স্বার্গের K D K A স্টেশন থেকে। সে প্রোগ্রাম গৃহীত হয়েছিল কেবলি অপেশাদারদের নির্মিত রেডিও সেটে। পরবর্তী কয়েক বছর অপেশাদারদের রেডিও পার্টস্ কেনার ধুম পড়ে গেল। বিক্রীও হল অজস্র। বাস্তবিক পক্ষেই ওই সব

স্ফুটনোন্মুখ বিজ্ঞানীদের কাছে খুচরা বিক্রীর ফলে রেডিও শিল্পের প্রসার ঘটলো। তরুণদের এক অদ্ভুত খেয়ালে পেয়ে বসলো। অল্পবয়সের তরুণ এবং তরুণীগণও মাঝে মাঝে বেশ বিজ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগলো। জটিল রেডিও বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে যেন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চললো। নতুন নতুন সব শব্দ Amps, Ohms, Kilowatts, Amplifiers, Rectifiers প্রভৃতি—দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল জনসাধারণের মধ্যে। বড়রা সব অবাক হয়ে বসে থাকতো আর ছোটরা যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজেরাই রেডিও তৈরী করে দূরের মানুষকে নিকটে নিয়ে আসতো; ঘরে বসে শুনতো বড় বড় শিল্পীদের গান আর বৃহৎ লোকের কথা।

বিরাট একটি ব্রডকাস্টিং কোম্পানির এক কর্মকর্তা ইদানীং আমাকে বলেছিলেন যে বর্তমানে যাঁরা রেডিওর শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং পরিচালক, তাঁদের অনেকেই সেকালে যখন রেডিওকে আধা বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা বলে মনে করা হ'ত সেই সময়ে সাধারণ কারিগর হিসেবে তাঁদের জীবন শুরু করেছিলেন। সেকালে লোকে মনে করতো রেডিওর কথা লোকে শীঘ্রই ভুলে যাবে, ও বস্তু স্থায়ী হবে না। আর তার বদলে আজ দেখা যাচ্ছে রেডিও আজ বিরাট শিল্পে পরিণত হয়েছে,—বাণিজ্যিক সংবাদ আদান-প্রদান, সংবাদ প্রচার ও উৎপাদন প্রভৃতি এর বিভিন্ন শাখা।

নিউ ইয়র্ক শহরের নিম্নাঞ্চলে—হাডসন নদী থেকে অল্প দূরে—একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, সমগ্র বিজ্ঞান-জগতে পরিচিত এই সৌধ। স্থাপত্যের দিক থেকে সৌধটি পুরানো ধাঁচের। অন্ধকার রৌদ্রহীন দিনে এর ইঁট চুন সুরকিতে গড়া সম্মুখভাগ প্রায় ভীতিপ্রদ মনে হয়। ভেতরে কিন্তু একদল বিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়ার ও কারিগর এর আবহাওয়ায় চোখ-ধাঁধানো মানসিক দীপ্তি সঞ্চার করে রেখেছে। অনেক গুণগ্রাহী ভক্ত একে বলে 'অলৌকিকের গৃহ।' আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল যে বাড়ী থেকে প্রায় আশি বছর আগে তারপথে কথা প্রেরণ করেছিলেন, এই বাড়ীটি তারই উত্তরপুরুষ। টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে এর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে 'বেল টেলিফোন লেবরেটরীজ' বলে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক মহলে 'বিটিএল' নামেই সমধিক পরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠানকে প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য কার্যকলাপের পরীক্ষাক্ষেত্র বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে সর্বপ্রকার আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতিই মুখ্য উদ্দেশ্য। তার মধ্যেও আবার টেলিফোনের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

একথা বিশ্বাস করাই কঠিন যে, আমাদের গৃহের সামান্য টেলিফোনটির সঙ্গে আমাদের সামরিক বাহিনীতে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাংবাদিকতায় ও চিত্তবিনোদনে বহুল ব্যবহৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার সব বিস্ময়—রাডার, সোনার (Sonar) লোরান, শোরান (Shoran), রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির একেবারে যাকে বলে রক্তের সম্পর্ক, তাই রয়েছে। সমর বিভাগ যখন বিকিনিতে বিস্ফোরিত পারমাণবিক বোমার ফটোচিত্রের প্রয়োজনীতা অনুভব করলো, তারা 'বিটিএল'-

কেই ব্যাপারটা জানালো। ফলে ওরা এমন একটি ক্যামেরা উদ্ভাবন করলো যা দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ঐ বিস্ফোরণের ৮০০০ চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হল। সবাক চিত্র যখন একান্তই স্বপ্নের বিষয়, তখন 'বিটিএল'ই পর্দার ছায়া অভিনেতাদের মুখে বাণী সংযোজন করে; ফলে এক নতুন শিল্পের সৃষ্টি হয়।

রেলপথে যারা ভ্রমণ করে সেই অসংখ্য মানুষের নিরাপত্তা নির্ভর করে রেলের চাপ সহনশীলতার উপর। নির্ভুলভাবে সেই চাপ মাপবার কোন উপায়ই ছিল না। শেষে 'বিটিএল' এমন অতিসুবেদী যন্ত্র উদ্ভাবন করলো যে রেলের উপর আঙ্গুলের চাপ দিলে রেল কতটা নেমে যায় তাও ঐ যন্ত্রে মাপা চলে।

অনেক বিজ্ঞানে এবং শিল্পে নির্ভুল সময় একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন ঘড়িতেই দীর্ঘ সময় ধরে সময়ের গতি নির্ভুলভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়। 'বিটিএল'-এর বিজ্ঞানীরা কম্পনশীল কোয়ার্টজ স্ফটিক ব্যবহার করে এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে যাতে নির্ভুল সময় রক্ষা সম্ভব। এতে এক বৎসরে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় এদিক ওদিক হয়।

ভূমি-নিম্নে খনিজ লৌহ ও তৈলের অনুসন্ধান ছিল একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ, সময়ও যেত প্রচুর। শেষে 'বিটিএল' এক 'চৌম্বক নির্দেশনী' (Magnetic detector) আবিষ্কার করলো, এরোপ্লেন থেকে এই যন্ত্র চালনা করা সম্ভব। ভূমিতে দশ একর জমিতে সন্ধান চালাতে চালাতে এই যন্ত্র দিয়ে সমগ্রদেশের অনুসন্ধান সমাপ্ত হয়ে যেতে পারে।

'বিটিএল'-এর অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে এখানে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হল। তাদের এই সব দানের জন্য সমগ্র জগৎ তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিস্ময়ের কথা হল এই যে, এ সবেরই মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এর বহু উপাদান ও যন্ত্রাংশ এসেছে বেল টেলিফোন লেবরেটরীর মাল-খানা থেকে।

১৯০৭ সনের আগে পর্যন্ত লেবরেটরী বস্টনে অবস্থিত ছিল। তখন টেলিফোন শিল্পের বাইরে কেউ এর নাম জানতো না। এদের অবস্থাও ছিল কমবেশী সঙ্কটাপন্ন। সেদিনে শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত লেবরেটরীকে লোকে বাহুল্যস্বরূপ মনে করতো। আজকাল অবশ্য এমন লেবরেটরী হামেশাই দেখা যায়। বহু কঠিন বাধা সত্ত্বেও কয়েকজন সুস্থমস্তিষ্ক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের চেষ্টায় ঐ লেবরেটরী নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরিত হল। এর প্রাণস্বরূপ ছিলেন জন কার্টি নামক একজন অদম্য আইরিশম্যান। দেহে মনে তাঁর কর্মপ্রেরণা ছিল অফুরন্ত। তাঁর চারপাশের সকলে তাঁকে বলতো 'জ্যাক কার্টি'। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় যোগ্যতাসম্পন্ন এঞ্জিনিয়ার। কাজ হয়তো একটু বেশী শক্ত হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব কিছু ছিল না তাঁর কাছে।

নতুন উদ্বোধিত লেবরেটরীর চীফ এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কঠোর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁর বাজেট অপর্যাপ্ত হয়েছে বলে তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ডিরেক্টরদের এক রকম ধমকিয়ে টাকা বাড়িয়ে নিলেন। নানাদেশ খুঁজে তিনি যথেষ্ট বেতনে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনিয়ারদের নিযুক্ত করলেন, বেশ বিবেচনা-বুদ্ধি খাটিয়ে। কার্টির পরিচালনায় লেবরেটরীর প্রচুর উন্নতি হল, নতুন পরিকল্পনা নতুন পদ্ধতি চালু করা হল। প্রচলিত টেলিফোন পদ্ধতি প্রায় প্রতিদিন উন্নততর হতে লাগল। ক্রমশ বেশী দূরে লাইন স্থাপিত হয়ে চললো। ডেনভার থেকে যখন নিউ ইয়র্কের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হল, তখন পত্রিকা ও জনসাধারণ এটিকে পরম বিস্ময় বলে অভিনন্দন জানালো। এই সংবাদ যখন সানফ্রান্সিসকোতে পৌছল তখন সেখানকার নগর-প্রধানেরা তাঁদের নগরীর পুনর্নির্মাণ উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক উদ্বোধন উৎসব করবেন বলে স্থির করেছেন। কয়েক বৎসর আগে বিরাট অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সমগ্র নগরীটিই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তারা কার্টিকে লাইন সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ জানালেন যাতে তাঁরা উদ্বোধন দিবসে নিউ ইয়র্কের সঙ্গে কথোপকথন

করতে পারেন। চীফ ইঞ্জিনিয়ার বেশ জানতেন যে একাজ প্রায় অসম্ভব। ধ্বনিবর্ধক যন্ত্র (Amplifier) ছাড়া (তখনও Amplifier উদ্ভাবিত হয়নি) এই লাইনের জন্য ৩০০০০০ টন তামার তার প্রয়োজন হবে, খরচ হবে দশ কোটি ডলার। কার্টি জানতেন উদ্বোধনের আরও দু'বছর দেরী আছে। তিনি ঝোঁকের মাথায় বললেন, 'দেখা যাবে কী করা যায়।'

নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে তিনি কর্মীদের সবাইকে ডেকে নিয়ে বসলেন। তারপর তাঁর নিজস্ব শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভঙ্গীতে সমস্যার কথাটা তাঁদের ভেঙ্গে বললেন। একজন বলল, 'করা যাবে না।' আরেকজন বলল, 'এ প্রশ্নই উঠে না।' তৃতীয় একজন বলল, 'ভাল বর্ধক থাকলে একাজ করা যেত, কিন্তু তাতো নেই।'

কার্টি উত্তর দিলেন, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাক আমরা কোন প্রকারের বর্ধক প্রস্তুত করতে পারি কিনা।'

কয়েক মাস চলে গেল। যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও উপযুক্ত বর্ধক প্রস্তুত করা সম্ভব হল না। সানফ্রান্সিসকোর পক্ষে নিউ ইয়র্কের সঙ্গে কথোপকথন করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে মনে হতে লাগল।

একদিন একটি ছোট প্যাকেট হাতে এক তরুণ এলো কার্টির আপিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, 'আমার নাম লি ডি ফরেস্ট। আমার এই জিনিসটি হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে।'

'ওটা কী?'—কার্টি প্রশ্ন করলেন।

'একটি বর্ধক।'

'ওটা চলবে তো?'

তরুণটি যেন একটু আহত হল। 'অচল হলে আমি এখানে আসবো কেন?' সে জবাব দিল। সে প্যাকেটটি খুলে একটি ছোট কাচের বাল্‌ব্‌ বার করলো। ওর মধ্যে কিছু সরু তার, ধাতু ও রজন সজ্জিত ছিল। এমন জিনিস কার্টি কখনও দেখেননি।

যন্ত্রটির ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে ডি ফরেস্ট বলল, 'আমি টিউবটি কয়েক দিনের জন্য আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি, আপনি ভেবে দেখুন।' এই বলে সে চলে গেল।

কার্টি কিছুক্ষণ সেই কাচ ও ধাতুনির্মিত অদ্ভুত যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে এক আশ্চর্য আলোক দেখা দিল। বিড়বিড় করে নিজ মনেই তিনি বললেন, 'হয়তো এতেই কাজ হবে। যদি হয়, তাহলে!'

তিনি তাঁর দক্ষতম কয়েকজন সহকর্মীকে ডাকলেন। একঘণ্টা আলোচনার পরে তাদের একজন বলল, 'আমরা যদি একে বায়ুশূন্য টিউবে পরিবর্তিত করতে পারি, তবে এ যন্ত্র নিশ্চয় চলবে। আমাদের সমস্যার সমাধান এতেই রয়েছে।'

দিন রাত চললো কাজ; ডি ফরেস্ট টিউব পরিবর্তিত হল আধুনিক কালের সবচেয়ে বৈপ্লবিক যন্ত্রে। নতুন আকারে এ শুধু টেলিফোনে প্রাপ্ত কণ্ঠকেই বাড়িয়ে দেয়নি, বিজ্ঞানের ও শিল্পের কল্পনাতীত বহু আশ্চর্য ব্যাপারই সফল করে তুলেছে।

এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ডি ফরেস্টকে কার্টির আপিসে ডাকা হল। তাঁর বায়ুশূন্য টিউবকে টেলিফোন এ্যাম্প্‌লিফায়ারের কাজে একচেটিয়া ভাবে ব্যবহারের জন্য কোম্পানি তাঁকে ৫০,০০০ ডলার দিতে স্বীকৃত হল। যে প্রচুর অর্থসম্পদ তিনি পরবর্তীকালে লাভ করেন, এই টাকা তার প্রথম কিস্তি।

এক বছরের মধ্যে মহাদেশ সংযোজক লাইন স্থাপিত হল। কয়েক শ' মাইল পরে পরে একটি করে ডি ফরেস্ট টিউব বসানো হল। ক্রমক্ষীয়মান সঙ্কেত একেকটি টিউবে পৌঁছে আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল, তারপর আবার এগিয়ে চললো দীর্ঘ পথের পরবর্তী অধ্যায়ে।

১৯১৫ সনে সরকারীভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য লাইন উন্মুক্ত করা হল। সানফ্রান্সিসকোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল—তিন

হাজার মাইল দূরবর্তী পূর্ব-সমুদ্রোপকূলবর্তী নগরসমূহের সঙ্গে তার বাক্যালাভ করা সম্ভব হল।

সাফল্যে উৎফুল্ল হলেও কার্টি খুব সুখী হলেন না। এক উপকূল থেকে আরেক উপকূলের সঙ্গে বাক্যালাপ সম্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বক্তার কণ্ঠস্বর হয়ে পড়ে পাথরের খিলানে শব্দিত প্রতিধ্বনির মত অস্পষ্ট। এছাড়া টিউবের তারের কুণ্ডলীগুলি অনেক স্থানে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে বলে মনে হচ্ছিল। দুটি সমস্যাই লেবরেটরীতে সমাধানের যোগ্য। প্রতিধ্বনি বাদ দেবার মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছিল সহজ। কিন্তু বিদ্যুতের ব্যাপার! লাইনের উপরে বিদ্যুৎ কোথায় আঘাত করবে কেউ জানে না। সেটা কোন মেরামতী স্টেশন থেকে এক মাইল বা একশ মাইল দূরেও হতে পারে। স্থান নির্ণয়ের শুধু একটি পথই ছিল: ঝড়জলে ও বরফে অগ্রসর হয়ে খুঁজে ওটা বার করা। কাজটি ছিল একান্ত দুরূহ, সময়ও নষ্ট হ'ত প্রচুর।

আবারও কার্টি কয়েকজন প্রধান এঞ্জিনিয়ারকে ডাকলেন। বললেন 'দেখো, আমি এমন একটি যন্ত্র চাই যাতে লাইনে কোথায় গোলমাল হয়েছে ঠিক ধরা পড়বে। আমি জানি একাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমি চাই তোমরা একাজ করবে।' তাঁর বক্তব্যে যুক্তি ছিল না কিন্তু কথা কয়টি ছিল সুস্পষ্ট।

আবার 'বিটিএল'এ রাতের পর রাত আলো জ্বেলে চললো গবেষণা। একদিন সকালে কার্টি আপিসে এসেছেন, নিদ্রাজড়িত চোখে একজন এঞ্জিনিয়ার তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল—তার হাতে কী একটি ড্রয়িং। সে সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলল, 'মিঃ কার্টি, মনে হয় আমি সমস্যার সমাধান পেয়েছি।'

কার্টির টেবিলে ড্রয়িংটি মেলে ধরা হল। দুজনে ড্রয়িং-এর ত্রুটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেন। কার্টি সিগার নামিয়ে একহাত যুবকের কাঁধে রেখে বললেন, 'সম্ভবত তুমি ঠিকই সমস্যার সমাধান করেছো। আমি এখুনি এটা কারখানায় পাঠাচ্ছি।'

কয়েক মাস পরে সমগ্র লাইনে প্রয়োজনীয় সব স্থানেই তড়িৎ-নিরোধক স্থাপন করা হল। একদিন বিকেলে সূর্যাস্তের পরে এক সুতীব্র বিদ্যুৎ-ঝড় প্রবাহিত হল বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে, প্রচুর ক্ষতিও হল লাইনের। মেরামতী কারিগরেরা নতুন যন্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, লাইনে কোথাও বিচ্যুতি ঘটলেই যন্ত্রে তা ধরা পড়বে। সহসা ডায়ালের উপর একটি কাঁটা কাঁপতে কাঁপতে একস্থানে থেমে গেল। একজন এঞ্জিনিয়ার একটি স্লাইড রুল ও পেন্সিল নিয়ে একটু অঙ্ক কষলো।

'দুই-আট-সাত নম্বর থামে লাইন ভেঙ্গেছে,' ঘোষণা করলো সে। তারপর টেলিফোন লাইনের একটি ম্যাপ দেখে বলল, 'এখান থেকে ওটা মাত্র মাইল দুয়েক দূরে। সবাই রওয়ানা হয়ে পড়।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এক ট্রাকে করে কিছু কারিগর ২৮৭নং থামের দিকে ছুটে চললো ঝড়ে জলে অন্ধকারে। থামটি খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই, শহরের পথে নম্বর-লাগানো বাড়ির মত। মই লাগিয়ে একজন কর্মী থামে উঠে গেল। নিচে সংশয়াকুল চিত্তে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, চীৎকার করে তাদের কাছে সে বলল, 'ঠিক হয়েছে, এখানেই ভেঙ্গেছে বটে।' সামান্য সময়ের মধ্যেই লাইন সারিয়ে ফেলল সকলে।

সকলে যখন স্টেশনে ফিরে এলো তখন তাদের একজন বলল, 'আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।'

আরেকজন জবাব দিল, 'বেলের প্রথম টেলিফোনের সময়েও সকলে তাইই বলেছিল।'

এটি 'বিটিএল' এর আরেকটি বিজয়বার্তা। তাদের বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তারা বহু কাজের সময় বাঁচিয়ে দিল। অনেক কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেলো সকলে। টেলিফোন চলার সময় বাধাপ্রাপ্ত হলে কোম্পানির যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা থেকেও ওরা মুক্তি পেলো। এ ছাড়া দীর্ঘদূর

স্থানের সঙ্গে টেলিফোন ব্যবহারকারীরাও অযথা বিলম্ব ও বিরক্তির কবল থেকে রেহাই পেলো। সংক্ষেপে বলা চলে এটি সব দিকের বিচারেই একটি সফল কাজ।

দুর্ধর্ষ কার্টি কিন্তু তখনও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। একদিন বিকেলে তিনি প্রধান কর্মচারীদের সবাইকে ডেকে নিয়ে বসলেন আবার। স্বভাবতই তাঁর কণ্ঠ ছিল কর্কশ। সেই কর্কশ কিন্তু সদয় কণ্ঠে তিনি বললেন 'দেখ, আমরা মনে করি আমরা খুব চালাক, কিন্তু আসলে আমরা যতটা মনে করি ততটা চালাক আমরা নই। হাজার হাজার মাইল তামার তার আর শত শত কর্মী নিয়োগ করে একবারে একটি বার্তা শুধু চালনা করছি আমরা। অথচ আমাদের একবারে বহু বার্তা চালনা করতে পারা উচিত। প্রতিটি বার্তা তার নির্ধারিত পৌনঃপুন্যের ধারা বেয়ে চলবে। আমি জানি তোমরা বলবে 'এ অসম্ভব'। কিন্তু ওকথা অনেকে অনেকবার অনেক বিষয় সম্বন্ধেই বলেছে; পরে দেখা গেছে তাদের কথা সত্য নয়। যাই হোক, এবার সমস্যাটার কথা তোমরা শুনলে। একদিন না একদিন একটা কিছু নিয়ে আমাকে সংবাদ দেবে কেউ; আমি সেই প্রতীক্ষা করবো।'

দু'বছরের আগে সেই, 'একটা কিছু' কিন্তু কার্টির টেবিলে এলো না। এটি প্রতি জোড়া তারে একসঙ্গে চারটি বার্তা প্রেরণের পরিকল্পনা। কার্টি সোৎসাহে বলল, 'এটা ভালই। কিন্তু এতে খুব বেশী কিছু এগুচ্ছে না। চারটে বার্তার বদলে আমি চাই চল্লিশটি বা তার বেশী বার্তা প্রেরণ করতে।'

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে শিল্পক্ষেত্রে দেখা দিল ওলট-পালট। 'বিটিএল' থেকে এঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীরা সৈন্যদলে গিয়ে যোগ দিল। তবু কিন্তু কার্টির সেই প্রিয় বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলতে লাগল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সমাধান পাওয়া গেল। অগ্নিনির্বাপক হোজ পাইপের মধ্যে দিয়ে জলের মত বহু বার্তা তখন তারের মধ্য দিয়ে একযোগে চলাচল করতে লাগল।

ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নতুনতর বিস্ময় রেডিও শুধু জনসাধারণের নয়, বিজ্ঞানীদের মনোহরণ করে বসেছে। বিজ্ঞানের যে-কোন সামান্যতম উন্নতির প্রতি বেল লেবরেটারীর সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো। এক্ষেত্রেও বেতারে সংবাদ প্রেরণের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে তারা গবেষণা চালাতে লাগল।

কার্টি সিগন্যাল কোরে কর্ণেল হয়ে বিদেশে চলে গেছেন তখন। তাঁর অনুপস্থিতিতে 'বিটিএল'-এর কর্মীরা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করে চললো।

দুজন উৎসাহী বিজ্ঞানী একত্রে হাতে যা উপাদান ছিল তা দিয়েই একটি প্রেরকযন্ত্র উদ্ভাবন করলো। একটি অদ্ভুত ও জটিল যন্ত্র তৈরি হল বটে, কিন্তু কাজ চললো ওতে। এর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্মাতারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে হনলুলু পর্যন্ত এবং শেষে প্যারিস পর্যন্ত মৌখিক বার্তা প্রেরণে সক্ষম হল। সামরিক বিভাগ এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ করলো সঙ্গে সঙ্গে। এই দুই দুঃসাহসী গবেষককে ওয়াশিংটনে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ডেকে নেওয়া হল। সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ওদের বুদ্ধি দিল সমুদ্রপারে বেতার বার্তা প্রেরণের কথা ভুলে যেতে এবং চলন্ত এরোপ্লেনের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা চালাতে।

কয়েক মাস পরেই একদিন কয়েকখানা এরোপ্লেনে রেডিও টেলিফোন যন্ত্র স্থাপন করে দেওয়া হল। পাইলটেরা এই প্রথম ভূমির সঙ্গে বা অন্য প্লেনের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে সক্ষম হল। এই ব্যবস্থা ছিল অবশ্য পরীক্ষামূলক। প্রথম যুদ্ধ থামবার অনেক পরেই শুধু এরোপ্লেনে রেডিও টেলিফোনের ব্যবহার বহুল প্রচলিত হয়।

যুদ্ধ থেকে ফিরে কার্টি এসে আবার কোম্পানির প্রধানের পদে বসলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দক্ষতম সহকারীদের অনেকেই রেডিও সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থায় একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে বসবে—এই বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করেছিল। ইতোমধ্যেই

তারা আকাশে এরোপ্লেন ও সমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে কথোপকথন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা অপেরা গায়কদের গানও বেতারে প্রেরণ করছিল ; যন্ত্রসঙ্গীতও বেতারে প্রেরণ সম্ভব, এ বিশ্বাস তাদের ছিল, যদিও তখনও যুক্তরাষ্ট্রে খুব কম গৃহেই গ্রাহকযন্ত্র স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

কার্টির সমগ্র জীবনই উৎসর্গীকৃত টেলিফোন শিল্পের উন্নতিসাধনে ; তাঁর মনে সংশয় জাগলো রেডিও দেশের মধ্যে টেলিফোনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সহকারী কর্মীদের উৎসাহ তো দাবিয়ে দেওয়াও অনুচিত। আবিষ্কার প্রতিভা তো জলের কলের মত ইচ্ছে হলে খুলে বা বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

আবারও কর্মীদের ডেকে নিয়ে কার্টি তাঁর মনোভাব ব্যাখ্যা করে বললেন। বক্তব্য শেষ করলেন তিনি এই বলে, 'তোমরা যদি এই রেডিও নিয়ে মাথাই ঘামাবে, তবে একে টেলিফোনের প্রভু না করে তার দাসে পরিণত করো না কেন? আটলান্টিকের ওপারের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্র এখনও উন্মুক্ত পড়ে রয়েছে। ওখানে যদি রেডিওকে কাজে লাগাতে পারো তবেই তোমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রদ হবে।'

একজন জবাব দিল, 'আমরা আটলান্টিকের ওপারে মৌখিক বার্তা প্রেরণে সক্ষম হয়েছি বটে, কিন্তু সে সাফল্য সন্তোষজনক নয়। আবহাওয়া, চুম্বক-ঝড়, উত্তর-মেরু-জ্যোতি এবং সদাবিরাজমান স্থির বিদ্যুৎ, সব মিলে আমাদের বাক্য-সঙ্কেতকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়, অথবা তা একেবারে দুর্বোধ্য করে তোলে। আসলে ওটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাগ্যের ব্যাপার।'

কার্টি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর নীল আইরিশ চক্ষু জ্বলজ্বল করতে লাগল। বোঝা যাচ্ছিল তিনি দ্রুত চিন্তা করে চলেছেন। শেষে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'মুশকিল হল আমরা সবাই একেবারে অনেকখানি করতে চাই, পারি আর না পারি। তিন হাজার মাইলের

আটলান্টিক পার না করিয়ে, ত্রিশ মাইল দূরের কোন স্থান নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায়। লস এঞ্জেলেস্ থেকে ক্যাটালিনা দ্বীপের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ স্থাপন করে তারপর আরও দূরে চেষ্টা করা যায়।' তাঁর যুক্তির সরলতায় সহকারীরা বশীভূত হল। কয়েক মাস পরে সত্যিই ঐ দ্বীপের সঙ্গে মূলভূভাগের রেডিও টেলিফোনে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল।

শীঘ্রই যে নতুন ব্যবস্থা ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এ সন্দেহ কারও মনে জাগেনি। একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ঐ সমগ্র অঞ্চলটি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হল। দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে সমুদ্র ক্যাটালিনা দ্বীপকে গ্রাস করেছে। মূলভূভাগের অনেকেই দ্বীপের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করলো। নতুন স্থাপিত টেলিফোন-ব্যবস্থায় একটুও গোলযোগ দেখা গেল না। দ্বীপের অধিবাসীদের জন্য শঙ্কা শীঘ্রই দূর হয়ে গেল।

কার্টি'র চেয়ে সন্তুষ্ট আর কেউ হল না। টেলিফোনের সঙ্গে রেডিওর মিলন ঘটেছে। এমনি করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগ আরম্ভ হল।

কার্টি'র পরিচালনায় 'বিটিএল'-এ প্রতিদিনই কিছু না কিছু আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও উন্নতি সাধিত হচ্ছিল। তারই ফলে গড়ে উঠেছে আজকের ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

লাউডস্পীকার আজ সুপরিচিত বস্তু। কিন্তু কার্টি'ই প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন, তারপর এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। প্রেসিডেন্ট উইলসন সুবক্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় পর্যন্তও মাত্র কয়েক শ' লোকের জনতা সুস্পষ্টরূপে মৌখিক বক্তৃতা শুনতে পেতো।

একবার ম্যাডিসন স্কোয়ার উদ্যানে এক স্পোর্টস্ উপলক্ষে কার্টি ব্যালকনিতে পেছনের সীটে বসেছিলেন। সেই পুরানো ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে

প্রায় দশ হাজার দর্শক জড়ো হয়েছিল। একজন অফিসার ফগহর্ণের মত জোর গলায় ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন। তার কথা কি হিন্দুস্থানী না আর কোন ভাষায় তা কার্টি বুঝতে পারছিলেন না। মাঝে মাঝে এক আধটি শব্দ বা শব্দাংশ শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি।

সেই বিরাট জনমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র কার্টিই মানুষের কণ্ঠস্বর প্রসারণের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। কার্টি তখনই চিন্তা করেছিলেন ঐরূপ ঘোষকদের কণ্ঠ কিরূপে বহুদূরে শ্রুতিগম্য করে তোলা যেতে পারে।

পরদিন সকালেই তিনি তাঁর দুজন সহকারীকে ডাকলেন। তারা ওখানকার সবচেয়ে দক্ষ এঞ্জিনিয়ার। কোনরূপ ভূমিকা না করেই তিনি সমস্যাটা তাদের জানালেন। বললেন, 'এই বাড়ীতেই এমন সব উপাদান ছড়িয়ে আছে যা জড়ো করে এমন যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব, যেন যন্ত্রে মানুষের কণ্ঠস্বর বহুগুণে বর্ধিত হয়ে শোনা যাবে। আমি চাই তোমরাই ঐ যন্ত্রটি এমন করে তৈরি করো যাতে মানুষের কণ্ঠ এক মাইল দূর থেকে শোনা যায়।'

এক ঘণ্টার মধ্যে এঞ্জিনিয়ার দুজন প্রথম লাউডস্পীকার তৈরির কাজে লেগে গেল। তারা সাধারণ টেলিফোন গ্রাহকযন্ত্রকে নকল মাইক্রোফোনে পরিবর্তিত করলো এবং তার সঙ্গে একটি শক্তিশালী ডি ফরেস্ট বর্ধক নল যুক্ত করে দিল। এর সঙ্গে আবার যুক্ত করলো একটি প্রকাণ্ড মেগাফোনের মাথায় সংলগ্ন অতিসুবেদী টেলিফোন গ্রাহকযন্ত্র।

টেলিফোনের টুকিটাকি থেকে তৈরি সেই কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রটি ওরা বেল লেবরেটারীর বাড়ী ছাদে বসিয়ে দিল। রাক্ষুসে মেগাফোন-টির মুখ হাডসন নদীর ওপারে এক মাইল দূরে অবস্থিত জারসি সিটির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল।

বাড়ীটির এক নির্জন প্রান্তে নতুন মাইক্রোফোনের পাশে বসে একজন এঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা করবার জন্য প্রথমে কয়েকটি অর্থহীন

শব্দ উচ্চারণ করলো ; তারপর একটি লেখা থেকে স্বাভাবিক কণ্ঠে খানিকটা অংশ পড়ে গেল। তার কথা বাইরে কামানের শব্দের মত ধ্বনিত হয়ে উঠলো বাতাসে। নদীর ধারে পথচারী পথিকেরা থমকে দাঁড়ালো। নোঙর করা সব জাহাজে জাহাজে সব কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গেল—সহসা শূন্য থেকে সেই ধ্বনি-মন্ত্র যেন তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নদীর ওপারে জারসির লোকেরা ভয়ে মূক হয়ে গেল—সেই বজ্রধ্বনির মত ভয়ঙ্কর শব্দ যেন আসন্ন ধ্বংসের ভেরীনির্ঘোষ।

এই বিস্ময়কর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এঞ্জিনীয়ার দু'জন ঐ যন্ত্রটির উন্নতিবিধানে লেগে গেল, ফলে টেলিফোন ব্যবস্থায় ওর স্থান হল। ছাদের উপরের সেই ভারী মেগাফোনের আকার ক্ষুদ্র ও সুদৃশ্য করা হল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, বক্তার কাছ থেকে বহু মাইল দূরেও একে কাজে লাগানো চলে।

শীঘ্রই যে কোন স্থানের জমায়েতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হতে শুরু হল। নৌবহরের জাহাজে, আকাশের এরোপ্লেনেও এর স্থান হল। রেল স্টেশন, স্কুল, সিনেমাগৃহ ও রেসকোর্সে এই যন্ত্র সাগ্রহে গৃহীত হল। সভার বক্তারা, উৎসবক্ষেত্রের গায়কেরা এর জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। অগ্নিনির্বাপক ও পুলিস বিভাগ তাদের সাজসজ্জার অঙ্গহিসেবে একে গ্রহণ করলো। ফলে সমগ্র দেশেই P.A. (Pnblic Address) পদ্ধতির বিস্তার হল।

ভার্জিনিয়ার আরলিংটনে অজ্ঞাত সৈন্যের কবরে দাঁড়িয়ে ১৯২১ সনে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং এই যন্ত্র ব্যবহার করে তখনকার দিনের হিসেবে পৃথিবীর বৃহত্তম শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বক্তৃতা দিলেন। নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত সর্বত্র এখানে ওখানে সহস্র সহস্র লোক যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীর প্রতি প্রেসিডেণ্টের সেই সম্মান-জ্ঞাপক বাণী শ্রবণ করলো।

যোগাযোগক্ষেত্রে আশ্চর্য উন্নতির যুগ সেটা। কার্টি'র কাছে চারি-দিক থেকে অনবরত পত্রাঘাত হ'ত, তাতে থাকতো অসংখ্য প্রস্তাব ও

উপদেশ। পিটসবার্গে K D K A স্টেশনে একটি কাঁদুনে ছেলের মত জন্ম হয়েছিল রেডিওর। অল্প কয়েক হাজার মানুষ মাত্র অপেশাদার নির্মিত সেটে রেডিওর বার্তা শুনতে পেতো। কিন্তু বাতাসে ভেসে আসা জীবন্ত মানবকণ্ঠ ও সঙ্গীতে তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত।

মানুষের কোন দিকে ঝোঁক তা বুঝতে কার্টি'র একটুও দেরা হ'ত না। তাই রেডিওর বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব সত্বরই পরিত্যাগ করলেন তিনি। তাছাড়া নিকট ভবিষ্যতেই যে ব্রডকাংস্টি ও টেলিফোনের সঙ্গে মিত্রতা ঘটবে এও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে তিনি একদল সহকারী এঞ্জিনিয়ারের উপর ভার দিলেন একটি ব্রডকাস্টিং স্টেশন স্থাপন করার; উদ্দেশ্য ঐ স্টেশন জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলবে। ১৯২১ সনে ঐ স্টেশনে কাজ চালু করার ব্যবস্থা সমাপ্ত হল। স্টেশনের আক্ষরিক নাম ছিল WBAY. যদিও তখন দেশে গার্হস্থ্য গ্রাহক সেটের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ—তবু এই নতুন স্টেশন সংবাদ, আমোদ-প্রমোদ ও লোকরঞ্জক নানা বিষয় নিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করতো।

যদিও অধিকাংশ শ্রোতারাই গৃহনির্মিত গ্রাহক সেটের ইয়ারফোন (earphone) দিয়ে প্রোগ্রাম শুনতো তবু ব্রডকাস্টিং যে শীঘ্রই লাভজনক শিল্পে পরিণত হবে সেটা তখনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণের আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে WBAY এক দুঃসাহসী পরীক্ষায় নামলো। তারা স্থির করলো পৃথিবীর বৃহত্তম অর্কেস্ট্রা নিউ ইয়র্ক ফিলহারমোনিকের কনসার্ট ব্রডকাস্ট করবে তারা।

শ্রোতাদের সমর্থন পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। এমনকি যে খবরকাগজওয়ালারা রেডিওকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছিল, তারাও অকুণ্ঠ প্রশংসা বর্ষণ করলো।

এই ব্রডকাস্টের বিষয় নিয়ে তখনও লোকের মুখে মুখে আলোচনা চলেছে। একদিন WBAY-র ম্যানেজারের কাছে এলো এক সম্পত্তিবিক্রেতা এজেন্ট। সে বলল, 'আমার কতকগুলি ঘর ও শহরতলীর

বাড়ী বিক্রী করার বা ভাড়া দেবার আছে। তোমাদের প্রোগ্রামের শেষে আমি সেগুলির বিজ্ঞাপন ব্রডকাস্ট করাতে চাই।'

ম্যানেজার ইতস্তত করতে লাগল। 'আপনি নিশ্চয় জানেন এ পর্যন্ত কোন ব্যবসার বিজ্ঞাপন ব্রডকাস্ট করা হয়নি। এতে কোন কাজ দেবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।' ম্যানেজার যেন লোকটাকে নিরুৎসাহই করতে চায়। কিন্তু তাকে দমানো গেল না। সে বলল, 'আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কত খরচ পড়বে ?'

উপরওয়ালারা সমর্থন করবে না ভয় করে ম্যানেজার দ্রুত হিসাব করে এমন এক দাম দিল যাতে লোকটা ফিরে যায়। 'প্রতি মিনিটে দশ ডলার। হয় রাজী হবেন, না হলে চলে যাবেন।'

এজেন্ট তাতেই স্বীকৃত। বলল, 'আমি রাজী।' সে পকেট থেকে তার সম্পত্তির তালিকা বার করলো। 'আমি হিসাব করে দেখেছি, এটা পড়তে দশ মিনিট সময় লাগবে।' একশ ডলার ম্যানেজারের ডেস্কে রেখে সে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম ব্যবসার বিজ্ঞাপন বেতারে ব্রডকাস্ট হল। আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেল সে বিজ্ঞাপনে। এজেন্টের টেবিলে শত শত অনুসন্ধান-পত্র এসে জমা হল। এক সপ্তাহের মধ্যে তার সম্পত্তি বিক্রী বা ভাড়া হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনে সেই একশ ডলার খরচা থেকে ব্যবসার নতুন দরজা খুলে গেল। প্রচুর টাকা আসতে লাগল টেলিফোন কোম্পানি, ব্রডকাস্টিং স্টেশন এবং বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের পকেটে।

রেডিওর প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কার্টির যে ভয় ছিল, তাও শীগগিরই চলে গেল। ব্রডকাস্টিং-এর ক্ষেত্র যত প্রসারিত হতে লাগল ততই সমগ্র দেশব্যাপী তাদের প্রোগ্রাম কার্যকরী করে তুলবার জন্য তারা টেলিফোনের লাইনগুলি ভাড়া নিতে শুরু করলো। আজ পর্যন্ত অনেকেই বুঝতে পারেন না যে, যে-সব রেডিও প্রোগ্রাম তাঁরা শ্রবণ করে থাকেন তা তাঁদের কাছে টেলিফোনের মধ্য দিয়ে

আসে। এক উপকূল থেকে যখন অন্য উপকূলে ব্রডকাস্ট করা হয়, তখন নিউ ইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেসে প্রেরিত প্রোগ্রাম ওর শতকরা নব্বই ভাগ পথই টেলিফোনের লাইন বাহিত হয়ে আসে। তারপর স্থানীয় ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে বেতারে এই প্রোগ্রাম শ্রোতাদের নিকট পেঁাছায়।

বছরের পর বছর ধরে বেল লেবরেটরীজ গ্রীণহাউজের কাজ করেছে। বহু পরিকল্পনার বীজ এখানে উপ্ত হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে, ফলপ্রদানও করেছে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য মূল ভাবের সঙ্গে প্রাপ্ত ফলের কোন সাদৃশ্যই থাকেনি। 'টকি' বা সবাক চলচ্চিত্রের উদ্ভাবন এ বিষয়ের চমৎকার উদাহরণ। গবেষকদের একটি গুরুতর সমস্যা ছিল এই যে বার্তাপ্রেরণ পদ্ধতির পরিবর্তন করলেই টেলি-ফোনে কণ্ঠস্বরেরও পরিবর্তন ঘটতো। কণ্ঠস্বরের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বেছে নেবার তাদের কোন উপায় ছিল না।

এবারও কার্টি'ই এগিয়ে এলেন মুশকিল আসান করতে। তিনি বললেন, 'ফোনোগ্রাফ রেকর্ডারে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের রেকর্ড নাও। তারপর আবার বাজিয়ে দেখা যাবে। তাহলেই পার্থক্য ধরা পড়বে।'

আসলে কিন্তু সমাধান অত সহজ ছিল না। সেকালের রেকর্ড ছিল খর্‌খরে কর্কশ; কণ্ঠস্বরের মধ্যে কেমন যেন এক ধরনের হাঁপানীর ভাব সঞ্চারিত হ'ত। তাতেও নিরুৎসাহ না হয়ে কার্টি তাঁর লোকদের বুদ্ধি দিলেন নতুন ধরনের রেকর্ডিং যন্ত্র উদ্ভাবন করতে, যাতে মানবকণ্ঠের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি রক্ষিত হয়।

কিছুদিন পরেই ইলেকট্রনিক রেকর্ডার তৈরি হল। এতে তৈরি রেকর্ড নিপুণ শ্রোতা কার্টি'কে আবার বাজিয়ে শোনানো হল। কণ্ঠ-স্বরগুলি শোনালো মসৃণ ও পরিষ্কার। পুরানো রেকর্ডে যা কখনও হয়নি, এই সব রেকর্ডে কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য বেশ বজায় রইল।

এই নতুন রেকর্ড নির্মাণ-পদ্ধতিটি এত বৈপ্লবিক ছিল যে কয়েকটি রেকর্ডিং কোম্পানি এই পদ্ধতি গ্রহণ করলো। রেডিওর আবির্ভাবে রেকর্ডের ব্যবসা মার খাবে বলে মনে হয়েছিল। তার আয়ুষ্কাল আবার বেড়ে গেল। নতুন ধরনের প্রস্তুত রেকর্ডের বিক্রী ধীরে ধীরে বেড়েই চললো। একজন শিল্পীর রেকর্ডের দশ লক্ষ কপি বিক্রীটা একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হল।

একদিন কার্টি'র এক তরুণ সহকারী এঞ্জিনিয়ার প্রধানের কক্ষে এলো কী বলতে। উৎসাহ ফেটে পড়েছে তার।

কার্টি' তাঁর কর্কশ সাগ্রহকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন 'কী ব্যাপার?'

একটু ভয়ে ভয়ে তরুণ বিজ্ঞানী থেমে থেমে বলল, 'আমরা মানুষের কণ্ঠ রেকর্ড করে, চলচ্চিত্রের পর্দায় বক্তাদের দেখাতে দেখাতে সেই রেকর্ড আবার বাজিয়ে শোনাতে পারি না কি? চিত্রে ও শব্দে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে আমরা বাস্তব জীবনানুগ সবাক ছবি পাবো।'

কার্টি' এবং সেই তরুণ দুজনেই জানতো যে এ ধরনের সবাক চিত্র নির্মাণের চেষ্টা পূর্বেও হয়েছে এবং তা ব্যবসা হিসেবে মার খেয়েছে, কারণ সে সব রেকর্ডিং সুবিধাজনক হয়নি, পর্দার বর্ধিতাকার ছবির কণ্ঠে শব্দ উঠেছে ইঁদুরের চিঁ চিঁ শব্দের মত। পুরাতন এডিসন রেকর্ডিং পদ্ধতিতে এই সব সবাক ছবি নির্মিত হয়েছিল এবং শব্দ বর্ধনের কোন যন্ত্রও তখন ছিল না।

বহু আলাপ-আলোচনার পরে কয়েকখানা সবাক চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হল। সবাক চিত্র নির্মাণের সম্ভাবতা হয় তাঁরা প্রমাণ করবেন, নয়তো অপ্রমাণ করবেন। কয়েকজন সঙ্গীত-শিল্পীর ও সুদক্ষ বক্তার চিত্র তোলা হল, তাদের কণ্ঠের রেকর্ডও করা হল। আশ্চর্য সুন্দর ফলও পাওয়া গেল। শব্দের আশ্চর্য সুডোল মানবিক বৈশিষ্ট্য পর্দার ছবিগুলিকে রক্তমাংসের মত জীবন্ত করে তুললো। এমন-কি রক্ষণশীল কার্টি'ও স্বীকার করলেন যে এই প্রচেষ্টার সম্ভাবনা প্রচুর।

সবাক চিত্রকে বাস্তবে সম্পূর্ণ করে তোলা এক কথা, আর তা বাজারে চালানো অন্য কথা। নির্বাক চিত্রের নির্মাণ-কেন্দ্র হলিউড এই প্রচেষ্টা আদৌ সমর্থন করলো না। পরীক্ষা করে দেখানোর পরেও বড় বড় ফিল্ম্ নির্মাতাদের এর কার্যকারিতায় বিশ্বাস করানো গেল না। কেউ বলল, দর্শকেরা এতে আকৃষ্ট হবে না; অন্যেরা লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে নতুন স্টেজ নির্মাণ করতে ও শব্দযন্ত্র বসাতে হবে দেখে পিছিয়ে গেল। তারপরে জানানো হল যে নির্বাক চিত্রের বহু বড় বড় মাইনের অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর ও ভাষা আদৌ শোনবার মত নয়। হয়তো ছ'ফুট দু' ইঞ্চি কোন অভিনেতার কণ্ঠস্বর প্রায় শিশুর কণ্ঠের মত। নির্বাক ছবির বদলে যে সবাক ছবি চলবে না তা প্রমাণ করবার জন্য অসংখ্য কারণ দেখানো হল।

মনে হল অনির্দিষ্টকালের জন্য সবাক চিত্রের প্রচলন স্থগিত থাকবে, কাজেই ওগুলি তাকে তুলে রাখা হল, ওখানেই পড়ে রইল কয়েক বছর। কার্টি ফ্রাঙ্ক বি. জিউয়েট বলে এক ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তির হাতে পরিচালনভার তুলে দিলেন। বেল লেবরেটরীর ইনি হলেন প্রেসিডেন্ট। কার্টি তখন বুড়ো হয়ে এসেছেন।

চেহারায়, ধরনে, ঐতিহ্যে ইনি ছিলেন কার্টি'র সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁর আকার ক্ষুদ্র, কণ্ঠস্বর কোমল হলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে ইনি ছিলেন বিরাট পুরুষ। তাঁর পরিণত জীবনের বহুদিন তিনি 'বিটিএল'-এ টেলিফোনের উন্নতি-বিধানে নিয়োজিত করেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কোম্পানির নানাদিকে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিলেন।

কয়েকজন গবেষক কোনদিনই সবাক চিত্রে তাদের বিশ্বাস হারায় নি। তারা জিউয়েটকে মনে করিয়ে দিত সবাক চিত্রের বিরাট ভবিষ্যতের কথা। তিনি উত্তর দিতেন, 'অপেক্ষা করো, একদিন তোমাদের বিশ্বাসের পুরস্কার পাবে।'

পশ্চিম উপকূলে থেকে একদিন এক টেলিফোন ব্যবসায়ী এসে-

ছিলেন লেবরেটরীতে কী কাজে। তাঁকে অনেক কিছু দেখানো হল, ঐ সঙ্গে দেখানো হল কয়েক বছর আগে তোলা কয়েকখানা সবাক চিত্র। অন্ধকার চিত্রগৃহে অবাক বিস্ময়ে তিনি শব্দ ও চিত্রের সেই আশ্চর্য সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করলেন। প্রদর্শনীর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সহসা চলে গেলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে রওয়ানা হলেন হলিউডে।

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স তখন চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে প্রধান। সোজা তাদের আপিসে গেলেন তিনি। বন্ধু স্যাম ওয়ার্ণারের মুখোমুখি বসে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। স্যামকে তিনি নিউ ইয়র্কে গিয়ে এই বিস্ময়কর জিনিসটি দেখতে রাজী করালেন শেষে।

তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে নিউ ইয়র্কে এসে স্যাম দেখলেন সেই সবাক চিত্র। প্রজেক্টরের শব্দ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্যাম তাঁর অংশীদার ভাইদের তার করলেন। 'এটা এক অদ্ভুত জিনিস, এসে দেখে যাও।'

ভাইয়েরাও এলেন, একটু অবিশ্বাস আছে, তবে মন আছে খোলা। সবাক চিত্রগুলি দেখেই তাঁরা বুঝলেন চলচ্চিত্রের নতুন যুগ শুরু হল।

নতুন কোম্পানি গঠিত হল—ভিটাফোন কর্পোরেশন। লাইসেন্স নেওয়া হল, শুরু হল প্রথম ছবি নির্মাণ। নামকরা সব অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে তৈরি হল ডন জুয়ান। অভিনেতারা কথা বলল না, কিন্তু ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার আবহসঙ্গীত নাটকের ভাব প্রকাশিত করলো। ছবিখানা বিস্ময় সৃষ্টি করলো, অনেকেই ভবিষ্যৎবাণী করলেন, নির্বাক ছবির দিন ঘনিয়ে এসেছে।

সাফল্যের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। 'জাজ সিঙ্গার' নির্মাণ করলেন তাঁরা, এতে আল জলসন কথা বলল, ভাবোদ্দীপক গান গাইল, সঙ্গে রইল সব সুদক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীরা। এই প্রথম দর্শকেরা ছবিতে অভিনেতাদের মুখের কথাও শুনলো। সংবাদপত্রের সমালোচকেরা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা

করলো। হাজার হাজার লোক সবাক ছবি দেখতে এলো, দেখে অবাক হয়ে ফিরে গেল। জাজ সিঙ্গারের সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চিত্রনির্মাতারা দর্শকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হল। সবাক চিত্র নির্বাকের স্থান দখল করলো। ফলে সৃষ্ট হল কোটি কোটি ডলারের শিল্প।

জিউয়েট ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। একদিন সহকারীদের সঙ্গে 'জলসন' চিত্রের কথা আলোচনা করতে করতে তিনি বললেন, 'আমরা যদি ঐ চিত্রগুলি টেলিফোন তারে প্রেরণ করতে পারতাম তাহলে বাস্তবিকই একটা কাজের কাজ হ'ত।' তিনি জানতেন এর আগে তারপথে স্থিরচিত্র প্রেরণের চেষ্টা কয়েকবারই সফল হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে উপদেশ দিলেন।

তাঁর কোমলতা সত্ত্বেও জিউয়েট কঠোর পরিচালক ছিলেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে টেলিফোনের তারে ফটোগ্রাফ, ম্যাপ ও ছবি পাঠানো যাবে এবং অপর প্রান্তে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত করা যাবে—এমন যন্ত্র নির্মাণের জন্য কর্মীরা দিনপাত পরিশ্রম করতে লাগল।

কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রমের পরে তিন মাইল দূরে ফটোগ্রাফ পাঠানো সম্ভব হল। কিন্তু সে ছবি অপর প্রান্তে সুস্পষ্ট হল না। পরে দূরত্ব বেড়ে গেল কয়েকশ মাইলে, কিন্তু খরচা হল অত্যন্ত বেশী।

জিউয়েট দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডাঃ আইভ্‌সের হাতে দিলেন এই কাজের ভার। কয়েকজন বাছাই করা বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে একত্রে কাজ করে তারা এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করলো যা টাইপরাইটারের চেয়ে বড় নয়। অল্প খরচে এতে এক উপকূল থেকে আরেক উপকূলে চিত্র প্রেরণ সম্ভব হল। এক্ষেত্রেও 'বিটিএল' সাফল্যলাভ করলো বটে, কিন্তু বাজার পাওয়া গেল না তত তাড়াতাড়ি। মনে হল, সবাক চিত্রের মত এই যন্ত্রও শিকেয় তুলে রাখতে হবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

তারপর হঠাৎ একদিন এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রধান পরিচালক দৈবক্রমেই এর এক প্রদর্শনী দেখলেন। টেলিফোন তারে ফটোগ্রাফ প্রেরণ এবং দূরবর্তী এক শহরে তা গ্রহণের ব্যাপার চাক্ষুষ করে তিনি শান্তভাবে মন্তব্য করলেন 'আমরা যে শত শত সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করি, এই যন্ত্র দিয়ে তাদের কাছে আমরা অতি দ্রুত নানাবিধ চিত্রও প্রেরণ করতে পারবো।'

পরবর্তীকালে 'তারফটো' এবং 'রেডিওফটো' সংবাদপত্র আপিসের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। এ কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই হল না, পৃথিবীর বহু অংশেই হল। নিউ ইয়র্কের অগ্নিকাণ্ডের সংবাদের বা ওয়াশিংটনে সরকারী কোন সম্মেলনের সংবাদের ফটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ লওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডেনভারের বা লণ্ডনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদের মত সংবাদ-চিত্রেরও প্রতি মিনিটেই মূল্য কমে যায়। সংবাদ প্রকাশের সাফল্য একান্তভাবে নির্ভর করে দ্রুততার উপর।

'তারফটো' উদ্ভাবনের পূর্বেও দ্রুত সংবাদ প্রেরণের জন্য টেলিটাইপ বহুলভাবে ব্যবহৃত হ'ত। এইরূপে এ টেলিফোন কোম্পানিগুলির বিরাট আয়ের উপায় হয়ে দাঁড়ালো। যদিও এ যন্ত্র এখন সকলেই ব্যবহার করে তবুও অনেকের নিকটেই এটা এক রহস্য হয়ে রয়েছে। যাই হোক, আধুনিক সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এটা সব চেয়ে কম জটিল যন্ত্র। এটা যেভাবে কাজ করে তা হল এই :

মনে করা যাক এসোসিয়েটেড্ প্রেসের কোন সংবাদদাতা কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করলো। সে তখন দৌড়ে যাবে কাছাকাছি কোন ফোনে বা টেলিগ্রাফ আপিসে ; অথবা সে হয়তো কোন সংবাদ-বাহকের হাতে, এমন কি এরোপ্লেনে করেও তার কাহিনী আপিসে পাঠাতে পারে। সেখানে আরেক জন খবরটি নতুন করে লিখে শত শত সংবাদপত্রে প্রেরণের উপযুক্ত করে নেয়। তারপর ওটা টেলিটাইপ অপারেটারের হাতে দেওয়া হয়। সে সাধারণ টাইপ-

রাইটারের মত একটি যন্ত্রে আশ্চর্য দ্রুতবেগে অক্ষরে অক্ষরে টাইপ করে চলে। প্রত্যেক সংবাদপত্র আপিসে যে টেলিটাইপ আছে সেখানেও ঐসঙ্গে একই অক্ষরে চাপ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী টাইপ হয়ে যায়। এইরূপে, ধরা যাক, নিউ ইয়র্কে যে কপি টেলি-টাইপ করা হল, একই সঙ্গে শত শত সংবাদপত্র আপিসে তার একখানা করে ডুপ্লিকেট কপিও তৈরি হল।

এই কিছুদিন পূর্বে এসোসিয়েটেড প্রেস ও অন্যান্য সংবাদ এজেন্সীগুলি সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। এর তুলনা করা চলে শুধু ষাট বছর আগে প্রবর্তিত লিনোটাইপ মেসিনের সঙ্গে। এই যন্ত্রকে বলে 'টেলিটাইপ সংস্থাপক,' একশ মাইল বা হাজার মাইল দূরবর্তী অপারেটারের হস্তচালনায় এই যন্ত্রে টাইপ সংস্থাপিত হয়। যারা সংবাদ এজেন্সীর কাছ থেকে সংবাদ নেয়, এমন নয় শতেরও বেশী সংবাদপত্র এই নতুন যন্ত্রে টাইপ বসাবার ব্যবস্থা করেছে।

সংবাদ এজেন্সীর হেডকোয়ার্টারে প্রচলিত টেলিটাইপের চাবির মত বোর্ডে একটি ফিতে পারফোরেট করে। সেই পারফোরেশনের ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ প্রবাহ বহু দূরবর্তী সংবাদপত্র আপিসে একটি ফিতেকে পারফোরেট করে। সঙ্গে সঙ্গে একটি মনিটরিং মেসিনে (Monitoring Machine) শব্দগুলি ছাপা হয়ে যায় এবং সম্পাদকেরা কাহিনীগুলি পড়তে পারে। এই ডুপ্লিকেট ফিতেটি তখন একটি টাইপ-সংস্থাপক যন্ত্রে পরিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কলমে কলমে টাইপ ছাপবার উপযুক্তভাবে বসে যায়।

এইরূপ দ্রুত ও দূরবিস্তৃত সংবাদ পরিবেশন, সারা দেশজোড়া অতিব্যস্ত তারের ও কেব্‌লের জাল পাতা না থাকলে সম্ভবই হ'ত না। 'অতিব্যস্ত' কথাটা বুঝেসুঝেই ব্যবহার করা হল। এক নিউ ইয়র্ক স্টেটেই প্রতিদিন গড়ে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টেলিফোন কল রেকর্ড হয়; তার মধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ স্থানীয় কল।

উন্নতি ধরনের টেলিফোনের চাহিদা যত বেড়ে গেল, তারে ও কেব্‌লে কাজের ভিড় বাড়তে লাগল। শত চেষ্টা করেও বেল এঞ্জিনিয়ারগণ একটি কেব্‌লে ষোলটির বেশী কথোপকথনের সার্কিট চালাতে পারলো না।

জিউয়েট বলতে লাগল, 'যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয়। একশটি বা তার বেশী পথ চাই। খুঁজে বার করতেই হবে সে পথ।' 'খরচ হবে বেশী' —কে একজন জবাব দিল। কিন্তু লোকটা কোন আপত্তিই শুনবে না। 'বার করতেই হবে পথ, কাজ করে যাও।'

সেদিন রাত্রে তাঁদের দুজন শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনিয়ার অনেক রাত অবধি বসে প্রধানের আদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। তাদের একজনের নজরে পড়লো মাথার উপরে একটি জলের পাইপ। কিছু একটা বলবার জন্যই সে বলল, 'কর্তা মনে করেন, পাইপের ভেতর দিয়ে যেমন জল চালনা করা যায়, তারের মধ্য দিয়েও তেমনি সংবাদ পাঠানো সম্ভব!'

অন্যজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক হয়েছে; তুমি ঠিক ধরেছো, পাইপের মধ্যেই সমস্যার সমাধান রয়েছে।'

কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা গোপনে কঠোর পরিশ্রম করে চললো। তারপর একদিন সকালে তারা দুজনে জিউয়েটের ঘরে ঢুকল। তাদের হাতে খানিকটা তামার টিউব।

'ওটা কি জিনিস?' জিউয়েট প্রশ্ন করলেন।

ওদের একজন জবাব দিল 'এটা কনসেন্ট্রিক পরিবাহক; এতে একসঙ্গে পাঁচশ বার্তার পথ হবে।' আরেকজন বাধা দিয়ে বলল, 'আর তাছাড়া আবহাওয়ার পরিবর্তনে ও আর্দ্রতায় এর কোন ক্ষতি হবে না।'

জিউয়েট সোৎসাহে বলে উঠল, 'মন্দ নয়, মন্দ নয়! এক হাজার বার্তা চলার পথ করতে পারবে কি?"

'চেষ্টা করতে পারি আমরা।

'বেশ, তাই করো! আশা করি কৃতকার্য হবে তোমরা।'

টেলিফোনের ইতিহাসে সে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ওর নাম হল 'কোক্সিয়াল কেব্‌ল্' (Couxial Cable)।

ওর বাইরে তামার টিউব, ভেতরে তামার তার। তার যাতে নলের গায় না লাগে সেজন্য এক ইঞ্চি পর পর অপরিবাহক চাকতি দিয়ে তারটা নল থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে।

'কোক্সিয়াল কেবল্' বাস্তবে কাজে লাগানোর আগে লেবরেটরীতে ও ফ্যাক্টরীতে কয়েক বছর ধরে চললো পরীক্ষা। ছ'টি অথবা আটটি তামার নল একত্রে শক্ত করে জড়িয়ে মোটা কেবল্ তৈরি করা হয়। এই কেব্‌লে একসঙ্গে সহস্র সহস্র কথোপকথন ও অসংখ্য ব্রডকাস্ট চলতে পারে। টেলিভিশন কিন্তু পৃথক পথে চলতে চায়, এজন্য আলাদা টিউব প্রয়োজন।

আজ হাজার হাজার মাইল অনুরূপ কেবল্ আমেরিকার মাটিতে পোতা আছে। হাওয়া, তুষার ও বজ্রবিদ্যুৎ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না এখন।

'বিটিএল'-এর গম্ভীর শান্ত পরিবেশ সত্ত্বেও আমেরিকার সামরিক বাহিনীকে এ নানাদিক থেকে সাহায্য করে আসছে। যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ ও প্রতিরোধে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও কলকৌশলের প্রয়োগ প্রয়োজন, এবং টেলিফোনের উপর যে সব সমরাস্ত্রের উৎপাদন নির্ভর করে, তার অনেক কিছুই বেল টেলিফোন লেবরেটরী থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

নৌবিভাগীয় বিজ্ঞানীরা গোপনে 'রাডার' সম্বন্ধে গবেষণা করছিল। কিন্তু বাজেটের টাকার অভাবে তাদের গবেষণা বন্ধ হয়ে গেল। হতাশ হয়ে তারা গেল 'বিটিএল' এর কাছে। গোপনতা রক্ষার অনুরোধ জানিয়ে তারা ওদের অবিলম্বে কাজ শুরু করতে অনুরোধ জানালো। 'তোমরা বলছো এই প্ল্যানগুলি গোপনীয়?'— নীরবে সেই সব প্ল্যান পরীক্ষা করে একজন এঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করলো। ওরা উত্তর দিল, 'নিশ্চয় গোপনীয়, কিন্তু সে প্রশ্ন করছো কেন?'

এঞ্জিনিয়ার শান্তকণ্ঠে বলল, 'তোমাদের জানা উচিত আমরা কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে কাজ করছি; কিন্তু এর অস্বাভাবিক গোপনীয়তার কথা তো কখনও ভাবিনি। আমরা নৌবিভাগে সর্বদাই সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

সপ্তাহখানেক পরে বেল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীদের ভাগ্যে সহসা এক আশ্চর্য সম্পদ লাভ হল। এক জাহাজ সোনার চেয়েও মূল্যবান একটি জিনিস নিয়ে এলো এক ব্রিটিশ মিশন। কাগজের মোড়ক খুলে প্রথমে বায়ুশূন্য সাধারণ জিনিসটিকে তেমন মূল্যবান কিছু বলে মনে হল না। বেলের লোকেরা ওটা দেখে কিন্তু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, কারণ তীব্র আলোতে জ্বলজ্বল করছিল ব্রিটেনের সবচেয়ে গোপন বস্তু, ব্রিটিশ রাডারের মহামূল্য উপাদান বিখ্যাত ম্যাগনেট্রন (Magnetron)।

ব্রিটেনের ম্যাগনেট্রন তৈরির সব ব্যবস্থা তখন বোমা পড়ে বানচাল হয়ে গেছে। আমেরিকার বিরাট উৎপাদন ব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না তখন।

মিশনের একজন সাগ্রহে প্রশ্ন করলো, 'ঠিক এই মত ডুপ্লিকেট টিউব তৈরি করতে ক'মাস সময় লাগবে?' ম্যাগনেট্রনের অভাবে ব্রিটেন বোমারু বিমানের নৈশ আক্রমণের সম্মুখে অসহায় হয়ে পড়বে।'

'আমরা এক্ষুণি কাজে লাগবো, আপ্রাণ চেষ্টাও করবো।'

এক সপ্তাহের মধ্যে কিছুটা উন্নত ধরনের ডুপ্লিকেট তৈরি হল, বেশী সংখ্যার উৎপাদনের ব্যবস্থাও হল। দু'মাস পরে হাজারে হাজারে ম্যাগনেট্রন তৈরি হতে লাগল।

রেডিও টেলিফোনীর উন্নতির জন্য 'বিটিএল' কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছিল। এমন যন্ত্র নির্মাণ করতে চাইছিল তারা যা থেকে অতি উচ্চ পৌনঃপুন্য-সম্পন্ন রেডিও-তরঙ্গ প্রেরিত হবে সরল রেখায় দূরবর্তী রিলে স্টেশনে। তাদের গবেষণা ও পরীক্ষায় টেলিফোন

সম্পর্কিত দিকেই ছিল আগ্রহ বেশী। কাজেই রাডারের যা মূল ব্যাপার তেমন কয়েকটি ঘটনার দিকে তারা আদৌ নজর দেয়নি।

অন্যদিকে যুদ্ধোদ্বেগগ্রস্ত ব্রিটেন তাদের প্রচলিত টেলিফোন পদ্ধতিকেই যথেষ্ট মনে করেছিল। কাজেই তারা কেবলমাত্র রাডারের জন্যই অশ্রুতপূর্ব রেডিও-তরঙ্গের পৌনঃপুন্য সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেছিল। ফলে তারা আবিষ্কার করেছিল ম্যাগনেট্রন। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেনের টিঁকে থাকবার আশা দেখা দিল।

ঐ অতি সহজ দেখতে টিউবটির শক্তি ছিল দৈত্যের শক্তি। এক-সঙ্গে কোটি কোটি রেডিও-তরঙ্গ ছুঁড়ে দিত সে, সেই তরঙ্গ সোজা চলে যেত লক্ষ্যস্থলে। তারপর আবার উৎসে ফিরে এসে রাডার-স্কোপে আলোকবিন্দু সৃষ্টি করতো, ফলে রাত্রির আকাশে লুক্কায়িত প্রতিটি শত্রুপক্ষীয় বিমানের অবস্থান নির্দিষ্টভাবে জানা যেত। এতে এন্টি-এয়ারক্র্যাফটের আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা থাকতো না।

যুক্তরাষ্ট্র যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়লো তখন ম্যাগনে-ট্রনকে আর ব্রিটেনের দান নয়, ভগবানের দান বলে মনে হল। 'বিটিএল' এর হাতে পড়ে এ শুধু এরোপ্লেন নয়, জাহাজ এবং ডুবো-জাহাজের অবস্থান জানবার জন্যও বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। একে কামানের সঙ্গে যুক্ত করে অদৃশ্য লক্ষ্যে প্রয়োগের জন্যও ব্যবহার করা হল।

যুদ্ধের বহু যন্ত্রপাতির মত রাডারও শান্তির কাজে প্রযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে একে পরিবর্তিত আকারে টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভি-শনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বেল টেলিফোন লেবরেটরীর কার্যকলাপ এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের সন্নিকটবর্তী করে তোলার কাজে এর দানের কথা আলোচনা করতে গেলে, এর চেয়ে অনেকগুণ বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এরা যে সব কাজে সাফল্যলাভ করেছে তার অনেক

গুলিই এত বিরাট যে তাদের অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে। এর তুলনায় এই কয়েক বছর আগে এরা একটি সামান্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, সেটা পেন্সিলের মাথায় রবারের চেয়ে বড় নয়। 'বিটিএল'-এর বিজ্ঞানী মহলে সকলেই বিস্মিত হল এটি দেখে।

একে বলা হয় ট্র্যানসিস্টার। দেখতে ক্ষুদ্র হলেও এর শক্তি প্রচণ্ড। বায়ুশূন্য টিউবে যে যে কাজ হয় তার সবই এ করতে পারে, তাছাড়াও অসংখ্য কাজ হয় এতে—আর এ সবই হয় অতি সামান্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা। টেলিফোন ব্যবসায়ে বর্তমানে এই শক্তিশালী বর্ধক যন্ত্রটির বহুল ব্যবহার হচ্ছে বহুবিধ কাজে, পূর্বে যেখানে শুধু বায়ুশূন্য টিউবই প্রচলিত ছিল। এত দ্রুত এর প্রসার ঘটেছে যে বর্তমানে চল্লিশ রকমেরও বেশী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ট্র্যানসিস্টার প্রচলিত রয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে একজন অভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম, 'ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ে ট্র্যানসিস্টারের স্থান কী হবে?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার মনে হয়, এর প্রভাব বায়ুশূন্য টিউব বা ম্যাগনেট্রনের মতই বৈপ্লবিক হবে। এর ক্ষুদ্র আকার ও সরল গঠনের জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও লাউডস্পীকার প্রভৃতি যন্ত্রের আকারও অনেক ক্ষুদ্র হবে, গঠনও সহজ হবে। ফলে ব্যয়ও অনেক কমে যাবে। টেলিফোনীতে, অথবা রাডার, শোরান, লোরান প্রভৃতি ক্ষেত্রে, কিংবা এদের সামরিক প্রয়োগ—ট্র্যানসিস্টার ভবিষ্যতে কী স্থান দখল করবে তা কেউ বলতে পারে না।'

প্রশ্ন করলাম, 'সহজ কথায় ট্র্যানসিস্টার কাকে বলে?'

'আসলে এটি আধা-পরিবাহক (Semi-Conductor) দুটি সরু তারের সঙ্গে যুক্ত একটি ক্ষুদ্র জারমেনিয়ম স্ফটিক। তার দুটিতে সার্কিট সমাপ্ত হলেই যে বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে, তার ব্যাখ্যা এক-মাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন।'

মার্কনি যেদিন আটলান্টিকের উপর দিয়ে অপর পারে তাঁর তিন ডটের সঙ্কেত প্রেরণ করেন, তার এক বছরেরও কম সময় আগে নয় বছর বয়স্ক একটি দেশত্যাগী বালক কানাডার পথে যুক্তরাষ্টে প্রবেশ করে। তার জন্ম হয়েছিল জার-শাসিত রাশিয়ায়; কিশোর ডেভিড সারনফ (David Sarnoff) কোনদিন সেই বেতারের যাতুকর বা তাঁর বিস্ময়কর কার্যকলাপের কথা শোনেনি। ছেলেটি তার স্নেহপরায়ণা মা ও ছুটি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল তাঁদের পিতার সঙ্গে যোগ দিতে। পিতাও কিছুদিন আগে শান্তি ও সমৃদ্ধির সন্ধানে পালিয়ে এসেছিল এদেশে।

মন্ট্রিলে নেমে মা ও ছেলেরা ট্রেনে গেল নিউইয়র্কের আলবানীতে, তারপর সেখান থেকে হাডসন নদীর এক রাত্রির জাহাজে গেল নিউ ইয়র্ক শহরে। ডেভিড জাহাজের ডেক থেকে সেই মহানগরীকে প্রথম দেখল—এই মহানগরীই পরবর্তীকালে হয়ে উঠলো তার স্থায়ী আবাস।

এই ছোট্ট পরিবারটি একটি জনাকীর্ণ ভাড়াটে অঞ্চলে বাস করতে লাগল। সেখানে ডেভিড সত্বরই চলনসই গোছের একটু ইংরেজী শিখে ফেললো, তারপর তার জীবনে প্রথম স্কুলে ভর্তি হল। পিতার সামান্য আয়ে সংসার চলে না ভালভাবে, তাই ডেভিড স্কুলের আগে ও পরে—তার জীবনের প্রথম ব্যবসা শুরু করলো—সে ব্যবসা খবরের কাগজ বিক্রীর। তার পরিচ্ছন্ন চেহারা ও প্রীতিপ্রদ আচরণ সহজেই খদ্দের আকৃষ্ট করতো, ফলে অঞ্চলের অন্যান্য কাগজওয়ালা ছেলেরা তার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। সেই দশ বছর বয়সেও সে বিশেষ কূটনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিল—পরবর্তী জীবনে ঐ কূটনীতিই

তাকে জীবনে সাফল্যলাভে সাহায্য করেছে ; এক এক করে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের এমনভাবে জয় করে নিল যাতে তার নেতৃত্বে সকলেই চলতে চাইতো।

অত কমবয়সের ছেলের পক্ষে কাগজ বিক্রীর কাজ ছিল কঠিন। প্রতিদিন সকালে চারটেয় উঠে বেরুতে হ'ত তাকে, কাগজ বিলির ট্রাকে গিয়ে দিনের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাগজ নিতে হ'ত তুলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কঠোর ছিল, কাজেই প্রতিদিনই ঠেলাঠেলি করে লাইনে দাঁড়াতে হ'ত, তারপর তাড়াতাড়ি স্কুলের আগেই সেগুলি বিলি করা শেষ করতো সে। সকালের খাদ্য ছিল তার প্রায়ই দু'একটি বাদাম ও এক কাপ কফি। সেন্ট এণ্ডরুজের কফি স্ট্যাণ্ডে এই কফি কিনতে পাওয়া যেত।

সে সময়ে রাশিয়ায় অবৈতনিক স্কুল ছিল না। অস্বাভাবিক কিছু নয় যে কিশোর দেশত্যাগী আমেরিকার সরকারী স্কুলের গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে মুগ্ধ হবে। তার একটি ক্লাসে ইস্পাতে খোদাই করা আব্রাহাম লিঙ্কনের একখানা প্রতিকৃতি দেওয়ালে টানানো ছিল। সেই ছবি ওকে মুগ্ধ করেছিল। সেই ব্যথামণ্ডিত মুখ ও সহানুভূতিপূর্ণ চক্ষু থেকে যেন নিপীড়িত মানুষের জন্য সান্ত্বনা বিচ্ছুরিত হতে থাকতো। সে মুখ ছিল সকলের জন্য স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতিতে উদ্ভাসিত।

যখন ক্লাসে লিঙ্কনের কথা আলোচনা করা হ'ত, সে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতো। দরিদ্র গৃহে ভাঙ্গা কাঠের কেবিনে জন্ম হয়েছিল সেই মহান মুক্তিযোদ্ধার, কোন রকমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবনী ওকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো। লিঙ্কনের জীবনের ছক তার জীবনপথ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিল। লিঙ্কন সম্বন্ধে স্কুল-লাইব্রেরীর প্রতিটি বই সে পড়তো ; পুরানো বইয়ের দোকানে কেনা অল্পদামের একখানা অভিধান ছিল তার সহায়।

বিকেলেও কাগজবিলি শেষ হলে সে সাধারণ পাঠাগার খুঁজে

তার পূজ্য নেতার জীবন ও তৎকালীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বই ধার নিত। ফলে অনেক আমেরিকানের চেয়েও সে অতি শীঘ্রই অনেক বেশী জ্ঞান আহরণ করে ফেলল।

পনর বছর বয়সে তার বাবা মারা গেল। প্রকৃতপক্ষে সে-ই হয়ে দাঁড়ালো পরিবারের কর্তা। মা ও ছোট ভাইদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পড়ল তার উপর। কাগজ বিক্রীর আয় তাদের প্রয়োজনের পক্ষে ছিল একান্ত অপর্যাপ্ত। সে একটি স্থায়ী কাজ খুঁজতে লাগল যেখানে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কাগজ ফিরি করা ছাড়া তার আর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, কাজেই ভবিষ্যৎ মনে হল অন্ধকার। অবশ্য তার ঐ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে যদি সে কোন খবরের কাগজের প্রচার বিভাগে কাজ পায়। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ছিল সর্বাধিক প্রচারিত কাগজ। নিয়মিত এই কাগজের পাঠক সে।

একদিন সকালে কাগজ বিলি শেষ করে তার একমাত্র ভাল সুটটি পরে স্কুলে না গিয়ে সে হেরাল্ড আপিসে গিয়ে হাজির হল। আপিসটি তখন ছিল হেরাল্ড স্কোয়ারে। পাশের ফুটপাতে অনেক কৌতূহলী দর্শক বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাগজ ছাপা দেখছে। সেও ভেতরের সেই কর্মব্যস্ততা দেখল, দেখল প্রেস থেকে অসংখ্য কাগজ বেরিয়ে আসছে, বাঁধের ফাঁক দিয়ে যেমন জল বেরিয়ে আসে। দেখতে দেখতে সেও কেমন এক আত্মীয়তা অনুভব করলো, কারণ, অতি ক্ষুদ্রভাবে হলেও সেও তো এই কাগজের প্রচারে খানিকটা সাহায্য করেছে।

মাথা উঁচু করে বুকে সাহস নিয়ে সে নিচের তলায় আপিস ঘরে ঢুকল। স্থানটি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত, কিন্তু সংবাদ-সংগ্রহের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। এই বিভাগের প্রধান কাজ ছিল 'কর্মখালি' ও 'ব্যক্তিগত' বিজ্ঞাপন সংগ্রহ—এ ব্যাপারে হেরাল্ডের বিস্তৃত খ্যাতি ছিল। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের খট্ খট্ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সে এক কোণে এক কাউন্টারে হাজির হল। এখানে 'Postal Telegraph' লেখা

একটি সাইনবোর্ড ঝুলছিল। কাউন্টারের ভেতরে একজন অপারেটার একটি সংবাদ প্রেরণ করছিল।

নিকটেই একটি ছোট ডেস্কে একটি চশমাপরা ভদ্রলোক, বেশ বুঝা যায় ম্যানেজার তিনি, একগাদা টেলিগ্রাফের পাতা উল্টাচ্ছেন। ডেভিডকে কাউন্টারে দেখে তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কী প্রয়োজন তোমার ?'

ডেভিড সাহস করে বলল, 'আমি একটি চাকরি চাই, এ বিষয়ে কার সঙ্গে দেখা করবো আমি ?'

ম্যানেজার আলোচকের দৃষ্টিতে আগাগোড়া তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'একটি চটপটে সংবাদবাহক ছেলের প্রয়োজন আমার। প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ডলার, প্রতি ঘণ্টা বাড়তি সময়ের জন্য দশ সেন্ট। দরকার হলে নিতে পারো একাজ, না হলে চলে যাও।'

কথা বলতে বলতেও ডেভিড শুনছিল টেলিগ্রাফ যন্ত্রের খট্ খট্ শব্দ। যে দূরদৃষ্টি সারা জীবন তার সহায়তা করেছে, সেই দূরদৃষ্টি বশেই সে বুঝতে পারলো যে সংবাদবাহক হিসেবে কাজ করতে করতেও এখানে টেলিগ্রাফি শিখতে পারবে সে। সাগ্রহে জবাব দিল সে, 'আমি নেবো একাজ।' তখন সে আদৌ বুঝতে পারেনি যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশাল সাম্রাজ্যের দরজা খুলে গেল তার কাছে, আর সে-ই একদিন এই সাম্রাজ্যের পরিচালক ও প্রেরণার উৎস হবে।

সেদিনও প্রতি সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ ডলার বেতন একটি পরিবারের ভরণপোষণ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কাজেই সে ঠিক করলো তার সংবাদপত্র বিলির কাজ চালিয়েই যাবে সে। অবশ্য এতে পোস্টাল টেলিগ্রাফ অফিসে কাজে যাবার আগে তার চার পাঁচ ঘণ্টা বাড়তি কাজ করে যেতে হবে। তার ভাইয়েরা বয়সে ছোট হলেও তখনই কাজে নেমেছে; বিকেলের কাগজ বিলির জন্য তারা পথের কোণে কোণে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াচ্ছে তখন।

প্রথম মাইনে পেয়ে তার থেকে ছ' ডলার দিয়ে ডেভিড একটি

পুরানো টেলিগ্রাফ চাবি ও মর্স সঙ্কেত-পুস্তক কিনল। প্রতিদিন অবসরের প্রতি মুহূর্তে সে ঐ বই পড়তে লাগল। রাত্রিতে বিছানায় বসে এক ঘণ্টা বা তার বেশী সময় ধরে সে টেলিগ্রাফ পাঠানো অভ্যাস করতে লাগল। দিনের বেলায়ও ম্যানেজার লাইনে কাজ কম থাকলে আপিসের যন্ত্রে অভ্যাস করবার অনুমতি দিল তাকে।

ছয় মাসের মধ্যে সংবাদবাহক ডেভিড টেলিগ্রাফিতে আশ্চর্য দখল লাভ করলো। আপিসের পেশাদার অপারেটারের সমান স্পীডে সে মর্স সঙ্কেতে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারতো।

ইতোমধ্যে, মার্কনি কর্তৃক ইংলণ্ড থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে সঙ্কেত প্রেরণের স্মরণীয় দিন থেকে শুরু করে 'বেতার'ও দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে বেতার টেলিগ্রাফি আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এর হেড কোয়ার্টার ছিল নিউ ইয়র্ক নগরীর উইলিয়ম স্ট্রীটে। ইউরোপে ও আমেরিকায় মার্কনি বেতার কোম্পানি নামে ছিল এর পরিচয়।

একদিন সকালে নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড তন্ন তন্ন করে পড়তে গিয়ে ডেভিড একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন দেখতে পেলো—'একজন জুনিয়ার বেতার অপারেটার চাই—আমেরিকান মার্কনি কোম্পানি।' অন্ধকার কক্ষে যেন আলো জ্বলে উঠলো। যে সুযোগ ও অবাধ সম্ভাবনার স্বপ্নও সে দেখেনি তারই সন্ধান পেলো সে। এ পর্যন্ত সে ভেবেছে সাধারণ টেলিগ্রাফ অপারেটার হিসেবে কাজ করবে সে. টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে, রেল কোম্পানিতে বা সংবাদপত্রের আপিসে। এই ক্ষুদ্র কর্মখালির বিজ্ঞাপন তার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিল। বেতার যদিও তার কাছে তখনও রহস্য তবু একথা সে জানতো যে, যে মর্স সঙ্কেতে সে দক্ষ, তারের টেলিগ্রাফির মত বেতারেও সেই সঙ্কেতেই বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়।

হেরাল্ডের বাড়ীর চূড়ায় ঘড়িতে বারোটা বাজল, ডেভিড লাঞ্চ না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যের নির্দেশে। আমেরিকান মার্কনি

কোম্পানির আপিসে পৌঁছে সে ট্রাফিক ম্যানেজারকে খুঁজে বার করলো জুনিয়ার অপারেটারের চাকরিতে দরখাস্ত করবার জন্য।

'তোমার বয়স কত?' ম্যানেজার প্রশ্ন করলো।

'শীগগিরই ষোল হবে আমার বয়স,' ডেভিড সাহসের সঙ্গে জবাব দিল।

'অপারেটারের কাজের পক্ষে বয়সটা অত্যন্ত কম বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু একজন চটপটে আপিস বয়ের প্রয়োজন আছে আমাদের। বেতন হবে সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ ডলার।'

একদিন যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে সে, এ বিশ্বাস তার ছিল। ডেভিড চাকরি নিল। এক বছর পরে সে উন্নতির প্রথম ধাপে উঠলো—জুনিয়ার অপারেটার নিযুক্ত হল সে।

আজ পর্যন্তও ডেভিড সারনফ বারে বারে বলে থাকেন যে, যে এক বছর তিনি আপিস বয় হিসাবে কাজ করেছিলেন, সেই সময়েই জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তিনি। সে কাজ অবশ্যই ছিল সুকঠিন। ঘৃণা করতেন তিনি সে কাজ, তাই কাজটিকে প্রীতিপ্রদ করে তুলবার চেষ্টা করতেন নানাভাবে। যেমন, যে সব চিঠি তাঁকে ফাইল করতে দেওয়া হ'ত সেগুলি সবই পুরোপুরি পড়তেন তিনি। তাঁর উপরওয়ালারা অনুমোদন করতেন, কারণ যে কোন চিঠি চাওয়া যাক তিনি তা অনায়াসে বার করে দিতেন। তাঁর স্বল্প শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একান্ত সজাগ ছিলেন, তাই এই চিঠিপত্র পড়াটাকেও তিনি ঐ ব্যবসা সম্বন্ধে বাস্তব শিক্ষা বলে মনে করতেন। অবশ্য তিনি তখন ছিলেন ঐ ব্যবসার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

এ ছাড়াও বেতার ব্যবসা পরিচালনার যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তিনি সেটা কোন ক্লাসে পড়ে লাভ করেন নাই। ফলে তিনি কোম্পানির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অন্য যে কোন কর্মচারীর চেয়ে বেশী তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কোম্পানির কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যদিও ছিল গৌণ, তবু তিনি এর ফলেই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত

ফললাভ করলেন—ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁর চমৎকার দখল জন্মালো। তিনি সর্বদাই পকেট অভিধানখানা সঙ্গে রাখতেন সাহায্যের জন্য। নতুন কথা পেলেই সেটা দেখতেন।

জুনিয়ার অপারেটার থেকে সারনফ চীফ অপারেটার হলেন। সেটা এমন সময় যে তখন 'সমুদ্রে নিরাপত্তা' আর কথার কথা নয়। আইন পাশ হয়ে গেছে তখন যে প্রত্যেক যাত্রীবাহী জাহাজে অন্তত দুজন করে বেতার অপারেটার থাকবে। জাহাজের অফিসার, নাবিক, এঞ্জিনিয়ার বা বেতার অপারেটার যেই হোক না কেন, সমুদ্রে জরুরী অবস্থায় বলিষ্ঠহৃদয় ও দুর্জয় সাহসী মানুষেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

তরুণ সারনফ ছিলেন বলবান, স্বাস্থ্যবান ও কাঁচা চামড়ার মত শক্ত। তাঁকে সপ্তসমুদ্রগামী জাহাজে বেতার পরিচালকের কাজ দেওয়া হল। তাঁর কাজের রেকর্ড ও রিপোর্ট পড়ে কিন্তু উপর-ওয়ালারা সাব্যস্ত করলেন সমুদ্রের চেয়ে স্থলেই কাজের বেশী উপযোগী হবেন তিনি। এর ফল হল এই যে কয়েক বছর আগে সামান্য আপিস বয় হিসেবে যেখানে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন, সেই আপিসেই সহকারী ট্রাফিক ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন তিনি।

সে সময়ে মার্কনি বেতার কেবল বায়ুবাহিত যোগাযোগের উপায় হিসেবেই ব্যবহৃত হ'ত। ডট্-ড্যাশ প্রথায় বার্তা প্রেরিত ও গৃহিত হ'ত। ম্যানেজারের পদে উন্নীত হলেও তখনও সারনফ কিন্তু সুযোগ পেলেই টেলিগ্রাফ যন্ত্রে বসে বার্তা প্রেরণ বা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বেতার ব্যবসার সেই প্রথম যুগে, ১৯১৬ সনেই, তাঁর আশ্চর্য দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল।

সেই বছরেই জেনারেল ম্যানেজারের কাছে একটি মেমোরেণ্ডামে তিনি প্রস্তাব করলেন গৃহে গৃহে বেতারে সঙ্গীত পৌঁছে দেবার জন্য রেডিও বাক্স তৈরি করা হোক। জ্ঞানীরা সব ঘাড় নেড়ে সারনফের অবাস্তব স্বপ্ন বলে সে প্রস্তাবকে একপাশে সরিয়ে রাখলেন।

সন্ধি হয়ে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হল, তখন রেডিওতে এক

বিরাট পরিবর্তন এসেছে। শুধু ডট্-ড্যাশে বার্তা প্রেরণ করা হ'ত পূর্বে, এখন এতে কথা বলা সম্ভব হল, সম্ভব হল গান গাওয়া। নতুন বায়ুশূন্য টিউব রেডিও টেলিফোনির দরজা খুলে দিল।

মার্কনি কোম্পানিগুলি ও আবিষ্কারগুলি অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ পরিচালনাধীনে, যুদ্ধের সময় সেগুলি আমেরিকান সরকারের হাতে এলো। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পরিচালনায় বেতার টেলিগ্রাফির মাধ্যমে উভয় গোলার্ধে বিস্তৃত এক স্বাধীন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হল। যুদ্ধ সমাপ্তির পরে একথা পরিষ্কার বুঝা গেল যে সুপ্রতিষ্ঠিত বেতার স্টেশনগুলি মার্কনি কোম্পানির হাতে তুলে দিলে আমেরিকার আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদেশীদের হাতে চলে যেতে পারে। আন্তঃসামুদ্রিক কেবল্‌গুলির মালিকানা ছিল তখন সম্পূর্ণরূপে বিদেশীদের হাতে।

এই অবস্থার মধ্যে ১৯১৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবিভাগ একটি সর্ব-আমেরিকান যোগাযোগ কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব করলো। এই প্রস্তাবের দূরদর্শিতা অনুভব করে সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি, বর্তমানে R. C. A. নামে পৃথিবীখ্যাত রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা গঠন করলো। মার্কনি কোম্পানির সমস্ত ব্যবসা ও সম্পত্তি এই নতুন কর্পোরেশনের হাতে গেল, ডেভিড সারনফ হলেন এর বাণিজ্যিক ম্যানেজার। R. C. A-র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্যনিরপেক্ষ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলা।

R. C. A. ১৯২০ সনের ১লা মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যক রেডিও যোগাযোগ স্থাপন করে—নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডনের মধ্যে কোম্পানির আটল্যান্টিক সার্কিটে বার্তা প্রেরণ করা হয়। ঐ বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, হাওয়াই, জাপান ও জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আমেরিকা রেডিও-যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্র পরিণত হয়।

R. C. A-র বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল যোগাযোগ শিল্প সম্বন্ধে ডেভিড সারনফের প্রচুর জ্ঞান। আপিস বয় থেকে তিনি বাণিজ্যিক ম্যানেজার হন, তাই প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁর হাতেকলমে অভিজ্ঞতা ছিল। লঙ্ দ্বীপে রকি পয়েন্টে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত রেডিও সেণ্ট্রাল যেদিন সমাপ্ত হল, সমস্ত জাতি-গুলির কাছে রেডিওগ্রামে এক অভিনন্দন পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন জি. হার্ডিঙ্ তার উদ্বোধন করলেন। বাণিজ্যিক ম্যানেজার ডেভিড সারনফ স্বয়ং সেই বার্তাটি টেলিগ্রাফ করেন।

সেই সময় পর্যন্ত রেডিওর মুখ্য ব্যবহার ছিল দু'টি স্থানের মধ্যে টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায়। সেক্ষেত্রে বেতার সঙ্কেতের আপেক্ষিক গোপনীয়তার ফলেই সাধারণ বিশ্বাস রক্ষিত হ'ত।

রেডিও টেলিফোনের কিন্তু তেমন কিছু গোপনীয়তা ছিল না। সে যুগের হাজার হাজার রেডিও সেটের মালিকদের মধ্যে যে কেউ হচ্ছে করলেই একান্ত ব্যক্তিগত কথোপকথনও শুনতে পারতো। এর ফলে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ল যে রেডিও টেলিফোনী কখনও সুবিস্তৃত লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হতে পারবে না। কারিগরী ও এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের কাছে এই সমস্যার সমাধান চাওয়া হল।

সারনফ নিজে এঞ্জিনিয়ার বা কারিগর কিছুই ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে রেডিও টেলিফোন ব্যর্থ হবে। এর তথাকথিত ত্রুটি গোপনীয়তা বজায় না থাকা। তিনি বললেন এটাই সার্বিক বার্তা প্রেরণের উপায়। তাঁর যুক্তি ছিল—রেডিও যদি কথা বহন করে নিতে পারে, তাহলে সে সঙ্গীত, সংবাদ প্রভৃতির রিপোর্টও বহন করতে পারে। গৃহে যদি উপযুক্ত একটি 'রেডিও সঙ্গীত বাক্স' থাকে, তবে সন্নিহিত শহর থেকে তাদের পরিধির মধ্যে সেই পরিবার কনসার্ট, বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি শুনতে পারে। এ ব্যাপার তিনি ১৯১৬ সনেই বুঝতে পেরেছিলেন।

আবারও তিনি তাঁর ডিরেক্টরদের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন, বিক্রীর উপযুক্ত একটি রেডিও গ্রাহক সেট উদ্ভাবন ও নির্মাণের জন্য। হিসাব দেখালেন আনুমানিক দশ লক্ষ গ্রাহক এরূপ সেটের জন্য পঁচাত্তর ডলার করে দিতে পারে। তাহলে তিন বছরের মধ্যে সাড়ে সাত কোটি ডলার ঘরে উঠবে। তাঁর প্ল্যান কার্যকরী হল।

R. C. A. ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সনের মধ্যে রেডিও সেট বিক্রী করে সাড়ে আট কোটি ডলারেরও বেশী ঘরে উঠালো।

আগেকার দিনের ব্রডকাস্ট প্রোগ্রাম যারা শুনতো তাদের অনেকেই স্ফটিক ডিটেক্টার, নলহীন ডিটেক্টার সেট ব্যবহার করতো। সুবেদী ডিটেক্টার ও বর্ধক হিসেবে বায়ুহীন নলের উদ্ভাবন অতি সত্বরই রেডিওর শ্রোতা অনেক বাড়িয়ে দিল।

১৯২০ সনেই পিটস্‌বার্গে ওয়েস্টিং হাউস স্টেশন KDKA থেকে প্রথম পরীক্ষামূলক ব্রডকাস্ট শুরু করা হয়। সেই বছরেই আমেরিকাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হার্ডিং ও কক্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল ব্রডকাস্ট করা হল। রেডিওর সাফল্যের সংবাদ সর্বত্রই ব্রডকাস্টিং সম্বন্ধে মানুষের ঝোঁক বাড়িয়ে দিল। অনতিবিলম্বেই বিনোদন ও সংবাদবহনের এই নতুন মাধ্যমের সীমাহীন সম্ভাবনা মধ্যহ্ন-সূর্যের মত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। রাতারাতি অসংখ্য ব্রডকাস্টিং স্টেশন গজিয়ে উঠলো। রেডিও শোনা জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হল।

রেডিও ব্রডকাস্টের অপরিসীম মূল্য সম্বন্ধে মানুষ সহসা ১৯২১ সনেই সজাগ হয়ে উঠলো। ঘটনাটি একটি মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার। ঐ বৎসরের ২রা জুলাই জারসি শহরে 'বয়েল্‌স্ থার্টি একর্‌স্'-এ (Boyle's Thirty Acres) দ্রুত নির্মিত কাঠের মণ্ডপে এই দুই মুষ্টিযোদ্ধা মিলিত হল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন-শিপের লড়াই, সকল খবরের কাগজেই আসন্ন সংগ্রামের ব্যাপার নিয়ে দু'চার কলম লেখা বেরুচ্ছিল। তাদের একজন জ্যাক ডেম্পসি (Jack Dempsey),

হেভিওয়েট লড়াইয়ে শক্তি ও বেগের প্রতিমূর্তি বিশেষ। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী জর্জেস কার্পেন্টিয়ের (George Charpentier), গতিসৌকর্যের পশ্চাতে লুক্কায়িত প্রচণ্ড শক্তির জন্য যার খ্যাতি। নির্ধারিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে মানুষের আগ্রহ অবাধ হয়ে উঠলো।

ক্লাবে, রেস্টুরেণ্টে, ট্রেনে ও গৃহে—সর্বত্রই এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠলো, কে জিতবে—ভারী ডেম্পসি, না তার হাল্কা প্রতিদ্বন্দ্বী ? লক্ষ লক্ষ ডলার বাজী ধরা হল, হাজার হাজার দর্শক জুলাই মাসের রৌদ্রে পচবার জন্য লাল মাটির পথে হেঁটে চললো জারসিতে।

সাধারণ ব্রডকাস্টের এই তো সুযোগ !

ব্রডকাস্টের বিরাট খরচা ভ্রূক্ষেপ না করে সারনফ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা কার্যকরী করতে এগিয়ে গেলেন—খেলার বেষ্টনীর পাশেই বসালেন R. C. A. মাইক্রোফোন। ঘোষক নিযুক্ত হল মেজর আই. এণ্ডরু হোয়াইট নামক একজন ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ। ব্রডকাস্টিং সম্বন্ধে কিছুই জানা না থাকাতে খেলোয়াড়দের দিকে নজর রেখে আঘাত-প্রত্যাঘাত অনুসরণ করে খেলার সংবাদ পরিবেশন করাতে তার খুব অসুবিধা হতে লাগল। ব্রডকাস্টে থেমে থেমে সংবাদ দেওয়ার ফলাফল সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে সারনফ নিজেই দ্রুতপদে এগিয়ে এসে একটানা বলে যেতে সাহায্য করতে লাগলেন তাকে।

সৌভাগ্যক্রমে যাদের স্ফটিক ডিটেক্টার সেট ও একটিউব গ্রাহকযন্ত্র ছিল তাদের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের ও প্রতিবেশীদের ভিড় জমে গেল বক্সিং সম্বন্ধে ব্রডকাস্ট শুনবার জন্য। শেষ ঘণ্টা যখন বাজলো তখন শ্রোতাদের অনেকেই সজাগ হয়ে উঠেছে যে তারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সত্যিকারের দর্শকদের অনেকের চেয়েই বেশী খবর জানে এ সম্বন্ধে।

সে যুগে ঘরে একটি ভাল গ্রাহক সেট থাকলে গৃহকর্তার সম্মানই বেড়ে যেত। এই মুষ্টিযুদ্ধের দিন সকালে আমি লঙ দ্বীপের পোর্ট ওয়াশিংটনের নর্থ হেম্পস্টেড কান্ট্রি ক্লাবে গল্‌ফ্‌ খেলছিলাম।

আমার সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে আমার একটি বিশেষ শক্তিশালী গ্রাহক সেট ছিল ; আমি স্থির করেছিলাম সেই বহুবিজ্ঞাপিত ব্রডকাস্ট আমি শুনবো। বাড়ী ফিরে যাবার আগে ক্লাবের একজন সভ্য প্রস্তাব করলেন যে আমি যেন যুদ্ধের খবরটা ফোনে ক্লাবকে জানাই। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম। আমার শোবার ঘরে টেলিফোন ছিল রেডিও সেটের ঠিক পাশেই ; কাজেই রেডিওতে প্রাপ্ত প্রতিটি শব্দই ফোনে জানানো আমরা পক্ষে খুবই সহজ ছিল।

ক্লাবে একজন সভ্য ফোনে বসে আমার নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদ প্রায় পঞ্চাশজন সভ্যের কাছে জানাতে লাগল। এদের কয়েকজন নিজেদের খেলা ছেড়ে মুষ্টিযুদ্ধের খবর শুনতে জড়ো হয়েছিল। এরপরে অনেকদিন ধরে আমার কাজের ক্ষতি হতে লাগল, কারণ ক্লাবের সভ্যগণ অনেকেই তাদের গৃহে রেডিও গ্রাহক সেট বসাতে চাইছিল। তাদের একজন শেষ পর্যন্ত লাভজনক এঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা ছেড়ে রেডিওর ক্ষেত্রে প্রবেশ করলো। বর্তমানে সে আমেরিকার বিশিষ্ট ব্রডকাস্টিং কোম্পানিগুলির একটির কর্মকর্তা ও বড় অংশীদার।

সেই বৎসর শরৎকালেই নিউ জারসির নিউআর্কে WJZ স্টেশন খোলা হল। ওয়েস্টিং হাউসের কোন এক ফ্যাক্টরির নির্জন প্রান্তে স্টেশনটি স্থাপিত হয়েছিল। ব্রডকাস্টিং স্টুডিওটি স্থাপিত হয়েছিল কোণাকৃতি সার্কাস তাঁবুর মত দেখতে এক ঘরে। গৃহকে সাউণ্ড-প্রুফ করবার জন্য প্রথম চেষ্টা হয়েছিল এখানে। জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল একটি পিয়ানো, কয়েকটি কুশ চেয়ার ও একটি ইলেকট্রিক হীটার। সারিবদ্ধ ড্রয়ারের মত দেখতে কাঁধ পর্যন্ত উঁচু একটি কন্ট্রোল বোর্ড ছিল ঘরে। বোর্ডের গায়ে মাঝে মাঝে দু'চারটে ডায়াল ও চাবি।

বেষ্টনীর একধারে টেবিলে বসে একজন এঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোলবোর্ডের চাবি ও সুইচগুলি চালনা করতো। মাইক্রোফোনটি ছিল কাঠের তৈরি ফাঁসিকাঠের মত দেখতে এক যন্ত্র। এর বাড়ানো হাত থেকে

ঝুলানো থাকতো টমাটোর কড়াইয়ের মত দেখতে 'মাইক'। স্টুডিও দেখতে সুদৃশ্য না হলেও এদের প্রোগ্রাম সব মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতো—প্রোগ্রামগুলি বিষয়বস্তুর দিক থেকে খুব উঁচুদরের ছিল বলে নয়, দিনের নির্দিষ্ট কোন সময়ে শুনবার মত কিছু জিনিস তারা পেতো বলে।

পর পর অতি দ্রুত আরও চারটি ব্রডকাস্টিং স্টেশন খোলা হল। ওগুলির একটি ছিল WBAY, নিউইয়র্কে আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানির পরীক্ষামূলক স্টেশন। এর ডাক নাম পাল্টে পরে করা হয় WEAF। এই স্টেশন থেকেই পরবর্তী বছরে ব্যবসা হিসাবে ব্রডকাস্টিং শুরু করা হয়। তার ফলে ব্রডকাস্টিং-এর খরচা কোথা থেকে আসবে সে সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়।

তারপর রেডিও ধীরে ধীরে স্টুডিওর বাইরে থেকেও প্রোগ্রাম চালাতে আরম্ভ করলো। প্রথম স্টুডিওর বাইরে থেকে ব্রডকাস্ট করা হল প্রিন্সটন-শিকাগো ফুটবল খেলা।

এই বছর নভেম্বরেই নিউ ইয়র্ক ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার একটি কন্‌সার্টও ব্রডকাস্ট করা হয়। উন্নাসিক সঙ্গীতরসিকগণও স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সঙ্গীত প্রচারের এক চমৎকার মাধ্যম পাওয়া গেছে রেডিও। তারপরেই এলো রেডিওর ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। প্রতিদিন সৃষ্টি হল এই ইতিহাসের নতুন নতুন অধ্যায়। রেডিও তখন আর কেবল আনন্দবিধানের মাধ্যম নয়, বিরাট শিল্পে পরিণত হয়েছে সে। হাজার হাজার লোক খাটছে তখন এ ব্যবসায়ে।

বছরে বছরে রেডিওর উৎপাদন বেড়ে চললো। একমাত্র ১৯২২ সনে মাসিক ২০০০০০ টিউব তৈরী করেছিল জেনারেল ইলেকট্রিক ও ওয়েস্টিংহাউস। ঐ বছর আমেরিকার জনসাধারণ ১০ কোটি ডলার খরচ করেছিল রেডিও সেট, টিউব, হেডসেট ও ব্যাটারী প্রভৃতির জন্য।

১৯২৩ সনে রেডিওর সবচেয়ে উন্নতি ঘটল। তার আগে পর্যন্তও রেডিও গ্রহণে সর্বদাই নানা বাধাবিপত্তি দেখা দিতই, ফলে রেডিও

শোনা খুবই কঠিন হ'ত। প্রথম যুদ্ধের সময় এক নতুন ধরনের সার্কিট উদ্ভাবিত হয়েছিল; R. C. A. নতুন ডিজাইন করে বহুসংখ্যায় তা উৎপাদন করতে লাগল এবং জনসাধারণ গৃহে গৃহে রেডিওতে তা ব্যবহারের সুযোগ পেলো। এই 'সুপারহেটোরোডাইন সার্কিট' ব্যবহারের ফলে রেডিওতে দরাজ ও তীক্ষ্ণ ধ্বনি পাওয়া গেল, যন্ত্রটি অতিশয় সুবেদী। জনসাধারণ ক্ষেপে উঠলো; হাজার হাজার পুরানো ধরনের সেট আবর্জনাস্তূপে জড়ো হল।

এখন আর হেডফোনের হাঙ্গামা নেই। সমগ্র পরিবার অথবা দলবদ্ধ শ্রোতারা সহজেই প্রোগ্রাম শুনতে পারে। সেই বছরের শেষের দিকে রেডিও স্টেশনের সংখ্যা ৩৬ থেকে ৫০০ শ'র বেশী হল। রেডিও তখন আর শুধু খেয়ালের বা শখের বস্তু নয়, বৃহৎ ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে সে। শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে গেল হাজার হাজার থেকে লাখে লাখে।

সকল মানুষের উপযোগী 'রেডিও সঙ্গীত বাক্সে'র যে স্বপ্ন দেখতেন ডেভিড সারনফ তা সফল হয়েছে। তাঁর প্রেরণাময় পরিচালনায় R. G. A-র ক্রমোন্নতি হতে লাগল। রেডিও শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বত্রই R. C. A-র প্রভাব অনুভূত হতে লাগল। ১৯২৩ সনের ১লা জানুয়ারী তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার হলেন। চরম উন্নতির পথে এটা আরেক ধাপ মাত্র।

সারনফের গুরুতর কর্তব্যভার সত্ত্বেও তিনি কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল প্রায় তৃতীয় নেত্রের পর্যায়ের। তিনি এসব ক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে কোম্পানির বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ারদের এ বিষয়ে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করতেন।

১৯২৩ সনের ৫ই এপ্রিল R. C.A-র ডিরেক্টারদের কাছে রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি টেলিভিশনও যথাসময়ে বাস্তবে পরিণত হবে। রেডিওতে শোনা ও দেখার কাজ

একত্রে করা যাবে যে যন্ত্রে তার যান্ত্রিক নাম টেলিভিশন। ভবিষ্যতে হয়তো প্রত্যেক গৃহের ব্রডকাস্ট গ্রাহকযন্ত্রেই টেলিভিশন ব্যবস্থা যুক্ত হবে এবং ফলে শ্রোতারা যেমন ব্রডকাস্ট স্টেশনের প্রোগ্রাম শুনতে পাবে, তেমনি তারা তাদের দেখতেও পাবে।'

জনসাধারণ তখনও 'টিভি'র কথা কিছুই জানে না—এ সেই যুগের কথা। কিন্তু সেদিনের সেই কল্পনাটিই পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে এবং মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে।

তখনকার দিনের রেডিওর শ্রোতারা ব্রডকাস্টিং-এর নিযুক্ত জন্য শিল্পীদের গুণাবলী সম্বন্ধে খুব বেশী সজাগ ছিল না। কিন্তু নূতনত্বের মোহ যখন কেটে গেল ক্রমে ক্রমে, তখন তারা বেছে বেছে শ্রুতি-সুখকর ও প্রীতিপ্রদ প্রোগ্রামগুলিই শুনতে লাগল শুধু। এই মনো-ভাব বুঝতে পেরে স্টেশনগুলিও প্রতিভাবান শিল্পী খোঁজ করতে শুরু করলো। WJZ স্টেশন নিউ জারসির নিউআর্ক থেকে নিউ ইয়র্ক শহরের নাট্যকেন্দ্রের স্টুডিওতে উঠে এলো। ফলে উন্নত ধরনের শিল্পসৃষ্টি মাইক্রোফোনের মাধ্যমে রেডিও গ্রাহকদের কাছে পেঁছতে লাগল। অন্যান্য স্টেশনও তাদের প্রোগ্রামের উন্নতির কাজে পিছিয়ে রইল না।

দূরদর্শী সারনফের দৃষ্টি সর্বদাই প্রসারিত ছিল ভবিষ্যতে। নিউ ইয়র্কের প্রোগ্রাম সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারিত করার মত ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। তাঁর চেষ্টায় নিউ ইয়র্ক, সেনেকটাডি, পিটসবার্গ ও শিকাগোর মধ্যে রেডিও প্রোগ্রাম চলা-চলের ব্যবস্থা হল।

১৯২৬ সনে ব্রডকাস্টিং-এর ক্ষেত্রে নানাদিক থেকেই যুগান্তর এলো। থিয়েটার ও অপেরার বহু প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরা মাইক্রো-ফোনে দাঁড়াতে চাইতেন না। ব্রডকাস্টিংকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভাবলেও ওটাকে তাঁরা সম্মানজনক মনে করতেন না।

নববর্ষের দিনে যখন বিখ্যাত আইরিশ গায়ক জন ম্যাককরম্যাক এবং মেট্রোপলিট্যান অপেরার তারকা লুক্রেজিয়া বোরি WJZ স্টেশনে আবির্ভূত হল তখন সকলেই তাদের মত পরিবর্তন করলো।

নানাদিক থেকেই এটা ছিল এক ঐতিহাসিক ব্রডকাস্ট। এর আগে কোন গায়ক আর কখনও এত অধিক সংখ্যক শ্রোতার কাছে গান গায়নি। সংবাদপত্রও আর কখনও এত প্রশংসা বর্ষণ করেনি। যারা রেডিও পছন্দ করতো না সেই শিল্পীরাও বুঝতে পারলো যে রেডিওতে তাদের শিল্পের অমর্যাদা হবে না। তাছাড়া মাইকে গান গাওয়া বেশ লাভজনকও বটে, কারণ স্টুডিও থেকে পয়সা দেওয়া হচ্ছিল ভাল।

রেডিওর জনপ্রিয়তা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এতে প্রচারকার্যের সুযোগও বেড়ে গেল। বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ট্রেড মার্ক বিখ্যাত অভিনেতা, অর্কেস্ট্রা, বক্তা, গায়ক ও সংবাদদাতার নামের সঙ্গে যুক্ত করে সেগুলিকে সাধারণ্যে পরিচিত করবার বিরাট সুযোগ পেলো। জনসাধারণের মনোহরণের শক্তিতেই রেডিও পৃথিবীর সব-চেয়ে প্রভাবশালী প্রচারমাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। একটা বিজ্ঞাপনের ফলে ক্রেতাদের কাছ থেকে বস্তা বস্তা চিঠি আসতে আমি দেখেছি।

ব্রডকাস্টিং-এর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকাতে এক বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন স্টেশনের ব্রডকাস্টিং অনেক সময়ে পরস্পরের বাধার সৃষ্টি করতো। শ্রোতারা অনবরত অভিযোগ করতো। শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সনেই আইন পাশ হল, পরে সৃষ্টি হল ফেডারেল রেডিও কমিশনের। তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল। সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেডিও দূরস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। আটলান্টিকের ওপারেও প্রথম রেডিও-ফটো প্রেরণ করা হল। উড়ো-জাহাজ নরজি (Norge) উত্তর মেরুতে উড়তে উড়তে যুক্তরাষ্ট্রে অভি-নন্দন পাঠালো। ডেম্পসে-টানির চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের সংবাদ লং ও শর্ট ওয়েভে পৃথিবীর সর্বত্র পাঠানো হল।

১৯২৬ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর রেডিওর ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিন R. C. A-এর অধীনে ন্যাশন্যাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানি সংগঠিত হল। এদের উদ্দেশ্য হল ব্রডকাস্টিং-এর শ্রেষ্ঠ প্রোগ্রাম স্থির করা এবং দেশের অন্য সব স্টেশনেও সেই প্রোগ্রাম পৌঁছে দেওয়া। ফলে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জোড়া রেডিও জাল বিস্তৃত হল।

উন্নত ব্রডকাস্টিং শুধু ভাল প্রোগ্রাম নয়, ভাল গ্রাহকযন্ত্রের উপরেও নির্ভর করে। সারনফ তাই R. C. A-র বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশ দিলেন এমন রেডিও সেট তৈরি করতে যার মূল্য হবে কম, কিন্তু শব্দ হবে সুস্পষ্ট। চূড়ান্ত মডেলটি যখন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখানো হল, তখন সারনফ বললেন, এবার 'দরিদ্রেরাও রেডিওতে বিনামূল্যে যে জিনিস পাবে ধনীদের পক্ষে তা মূল্য দিয়ে নিজস্ব করে পাওয়া সম্ভব নয়।' ঐ সময়ে পঞ্চাশ লক্ষ গৃহে রেডিওব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তখনও আরও ছু'কোটি দশ লক্ষ গৃহে রেডিও সরবরাহ করা প্রয়োজন। রেডিও তখন আর শুধু বিনোদনের বস্তু নয়, প্রয়োজনের সামগ্রী।

ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশ জুড়ে রেডিওর জাল বিস্তৃত হল। ১৯২৭ সনে নববর্ষের দিনে পাসডেনে রোজ বাউল (Rose Bowl) ফুটবল খেলার বিবরণ ৪০০০ হাজার মাইল স্থান জুড়ে ব্রডকাস্ট করা হল। এর পিঠ পিঠ ফাউস্ট (Faust) অপেরার ব্রডকাস্ট এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত পৌঁছল।

১৯২৭ সনে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রেডিও-আবিষ্কারের পেটেন্ট ছিল R. C. A-র হাতে। রেডিওর দ্রুত উন্নতির ফলে নানা দিকে ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল।

ছোট বড় সব রেডিও নির্মাতারা পেটেন্টের স্বত্ব ভঙ্গের ভয়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য R. C. A. প্রতিযোগী রেডিও নির্মাতাদের তাদের সব পেটেন্ট

ব্যবহারের অধিকার দিয়ে দিল। সামান্য কিছু রয়ালটি নিয়ে এ ব্যাপারে তারা লাইসেন্স দিয়ে দিত।

রেডিও শিল্পে তাঁর অশেষ দানের কথা স্মরণ করে ডেভিড সারনফকে রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট করা হল।

R. C. A-র প্রেসিডেন্ট হিসেবে নেতৃত্বের কাজ ছাড়াও ডেভিড সারনফ বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুবার সামরিক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রথমে তিনি ওয়াশিংটনে চীফ সিগন্যাল অফিসারের আপিসে কর্ণেল হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৪ সনের মার্চ মাসে তিনি মিত্রপক্ষের অভিযাত্রীবাহিনীর সুপ্রীম হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ বিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। অক্টোবর মাসে তাঁকে লিজন অফ মেরিট প্রদান করা হয়। ঐ বছরেই ২১শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত করেন। প্রায় এক বছর পরে এই পদ স্থায়ী হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুমান জেনারেল সারনফকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অপরিমেয় সাহায্যের জন্য 'Medal for Merit' প্রদান করেন।

যুদ্ধ-সমাপ্তির পরে বিদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে টেলিভিশন ব্রডকাস্টকারীদের সমিতি 'টেলিভিশনের ব্যাপারে তাঁর প্রাথমিক দূরদৃষ্টির জন্য এবং টেলিভিশনকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করার জন্য' তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। কমিটি তাঁকে 'টেলিভিশনের জনক' নামে অভিহিত করে।

সম্মানীয় সমিতির সভ্যগণ ভুলে গিয়েছিলেন যে বিশ বছর আগে সারনফ যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একসময়ে রেডিওতে দেখা ও শোনা দু'কাজই চলবে, তখন সমিতির উপস্থিত সভ্যদের অনেকেই সেটা অবাস্তব স্বপ্ন বলে তাঁকে দুয়ো দিয়েছিলেন।

মানুষ টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও রেডিও দ্বারা দূরত্ব জয় করার শত শত বৎসর পূর্বে একজন ওলন্দাজ চশমা ব্যবসায়ী দূরের জিনিসকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে আনার কাজে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি হান্স লিপারশি, ১৬০৮ সনে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করেন তিনি। এক বছর পরে গ্যালিলিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করেন, ফলে আকাশের রহস্যকে দৃষ্টিসীমার ভিতরে এনে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হল। তারপরে শতকের প্রায় শেষ ভাগ হতে শুরু করে বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বৈদ্যুতিক উপায়ে চিত্র প্রেরণের বিষয় চিন্তা করতে থাকেন।

ফটো-ইলেকট্রিক সেলের উদ্ভাবনের ফলে তাঁরা ও-বিষয়ে পরীক্ষা কার্যে বিশেষ প্রেরণা পেলেন। বিজ্ঞান-জগতে নব আগন্তুক এই ক্ষুদ্র সেলের আলোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। জি. আর. কেরী (G. R. Carey) নামক একজন আমেরিকান সর্বপ্রথম তারের মধ্য দিয়ে এক অস্পষ্ট ছবি প্রেরণে সক্ষম হলেন। তারপর একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী তারযোগে ছবি প্রেরণের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখালেন। কিন্তু প্রেরিত চিত্র এত অস্পষ্ট ছিল যে এর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হল না। দুজন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী টেলিগ্রাফ তারযোগে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় ফটোগ্রাফ প্রেরণের চেষ্টায় সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হলেন।

সমস্ত ব্যর্থ পরীক্ষাগুলোই চালানো হয়েছিল স্থিরচিত্র নিয়ে। চলন্ত চিত্র প্রেরণের বিষয় কেউ সে পর্যন্ত চিন্তা করেও দেখেনি। শেষ পর্যন্ত মরিস লা ব্ল্যাঙ্ক নামক একজন ফরাসী দীর্ঘ-দূর পথে তার-

যোগে চলন্ত চিত্র প্রেরণ করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞান-জগৎকে চমকে দিলেন। তিনি বললেন চলমান বস্তুর, যেমন ধাবমান ঘোড়ার স্থির ফটোগ্রাফ পরপর গ্রহণ করে তারপর সেগুলিকে আবার তেমনি পর পর তারপথে প্রেরণ করা সম্ভব। যদিও লা ব্ল্যাঙ্ক কোনদিন তাঁর তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করেননি, তবু অনেকে তাঁকেই চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক উদ্ভাবকের সম্মান দিয়ে থাকেন।

তখনও পর্যন্ত নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য ইলেকট্রনিক্স্ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। হেনরিখ হারৎস্ কেবলমাত্র প্রমাণ করেছেন যে তরঙ্গ দৈর্ঘের এককে এককে পরিমাপ করা সম্ভব। মার্কনি এই সামান্য তথ্যের উপর নির্ভর করেই বেতারে দীর্ঘ-দূর স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হলেন। অদৃশ্য ইলেকট্রনের পাখায় ভর করে তাঁর ঐতিহাসিক তিন ডটের সঙ্কেত আটলান্টিক পার হল।

আধুনিক টেলিভিশনের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল নিয়েপকাওয়ের (Niepkow) স্ক্যানিং ডিস্ক। এটি একটি ঘুরন্ত ধাতব থালা—পর পর অনেকটা গোলভাবে সাজানো কতকগুলি ছিদ্র ছিল এতে। ঐ ঘুরন্ত থালার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চলমান মানুষকে দেখলে তার মধ্যে জীবন্তের গতির সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হ'ত। বিষয়ের উপর আলো ও ছায়ার পরিবর্তনকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হ'ত, এবং সেটা তারপথে প্রেরণ সম্ভব ছিল। গন্তব্যস্থলে পৌছার পরে এই কার্যক্রম পাল্‌টে যেত ; বৈদ্যুতিক তরঙ্গই আবার আলো ও ছায়ায় রূপান্তরিত হ'ত এবং তারপথে প্রেরিত চলন্ত চিত্র হয়ে দাঁড়াতো। ফলাফল অসম্পূর্ণ হলেও, অন্য আবিষ্কারকেরা স্ক্যানিং ডিস্ক (Scanning disk) পদ্ধতি সম্পূর্ণ করার জন্য বেশ উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু সাফল্য তখনও বহুদূরে—টেলিভিশনকে মনে হল অসফল স্বপ্নমাত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধ এলো। শিশু রেডিও তখন ক্রমশ প্রচুর সম্ভাবনাময় হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু টেলিভিশন রইল শিকেয় তোলা, অনেকেই তার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। যুদ্ধের পরে রেডিও যোগাযোগের

ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান দখল করলো। লি ডি ফরেস্ট আবিষ্কার করলেন বায়ুশূন্য নল ; তার ফলে সঙ্গীত ও অন্যান্য জটিল শব্দ প্রেরণ করা সম্ভব হল। রেডিওতে চিত্তবিনোদন ও সংবাদ ব্রডকাস্টিং শুরু হল। যখন দেখা গেল ঘুরন্ত ডিস্কে প্রদর্শিত চিত্র বায়ুশূন্য টিউব ব্যবহার করে অনেকটা উন্নত ধরনের করা চলে তখন আবার টেলিভিশন নিয়ে পরীক্ষা চললো। দেশের বহু স্থানে জনসমাবেশে টেলিভিশন প্রদর্শিত হল, কিন্তু তখনও চিত্র তেমন সুস্পষ্ট হয় না, ছবিগুলি কেবলই কাঁপতে থাকে। চিত্রের কম্পন ছিল চক্ষের পক্ষে পীড়াদায়ক, আর অপ্রীতিকর না হলেও এ ছবি দেখা ছিল কষ্টদায়ক। মনে হল টেলি-ভিশনের স্বপ্ন সত্যিই সফল হবে না।

এই সময়েই দেখা দিলেন ভ্লাডিমির জ্বোরোকিন নামক এক তরুণ। ইনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞ রসিং-এর নিকট গবেষণা করেছিলেন। তিনি ওয়েস্টিংহাউস কোম্পানির গবেষণা বিভাগে একটি চাকরি নিলেন। শীঘ্রই ইলেকট্রনিক্সের ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম হল যথেষ্ট। যে নয় বৎসর তিনি ওয়েস্টিংহাউসে ছিলেন তার মধ্যেই বিজ্ঞানী মহলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, টেলিভিশন সফল হতে পারে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়। তিনি স্ক্যানিং ডিস্কের বদলে কোন ইলেক-ট্রনিক উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় দিন-রাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ১৯২৩ সনে তিনি আইকোনোস্কোপের (Iconoscope) পেটেন্টের জন্য দরখাস্ত করলেন। আধুনিক টেলিভিশন জন্ম নিয়েছে এই ইলেকট্রনিক চক্ষু থেকেই।

(R. C. A.) তৎকালে রেডিও-ইলেকট্রনিক গবেষণার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তারা দেখল জ্বোরোকিনের আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে টেলি-ভিশন সমস্যার সমাধান। অনতিবিলম্বে তারা তাঁকে কাজে নিযুক্ত করলো। এই তরুণ বিজ্ঞানী কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিভিশন সফল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল আবার। এক বৎসরের মধ্যেই

জোরোকিন কাইনেস্কোপ' (Kinescope) বা 'চিত্র-নল' উদ্ভাবন করলেন ; এই যন্ত্র আইকোনোস্কোপে ধৃত চিত্র গ্রহণ করে তাকে দৃশ্য করে তুলতো।

টেলিভিশনের সাধারণ ছক উদ্ভাবিত হলেও এ জিনিস তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বহু বিজ্ঞানী নানাভাবে একাজে সহায়তা করেছেন। আলেকজাণ্ডারসন, ফারনৃস্‌ওয়ারথ্‌ ফ্লেমিং, ডি ফরেস্ট, ডুমন্ট, বেল লেবরেটরিজ—সবাই টেলিভিশনের সাফল্যের দিন এগিয়ে আনতে চেষ্টা করেছে। জোরোকিন বহুদিন পরিশ্রম করে এক ইলেকট্রন ক্যামেরা প্রস্তুত করলেন, যন্ত্রটি বেশ কাজের উপযোগী হল। ঘরে ও বাইরে ক্যামেরা-শট্‌ তুলে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হতে লাগল।

কিন্তু তথাপি এর মধ্যে ত্রুটি রইল। আইকোনোস্কোপ গৃহাভ্যন্তরে তীব্র আলোর ঝলকের মধ্যে ছাড়া সন্তোষজনক চিত্র গ্রহণ করতে পারতো না। কিন্তু অত তীব্র আলোর ঝলক সৃষ্টি করতে গেলে স্টুডিওর তাপ একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠতো। বাইরেও কেবল উজ্জ্বল সূর্যালোকেই এ যন্ত্র কার্যকরী ছিল।

এই ত্রুটি সম্বন্ধে জোরোকিন বেশ সজাগ ছিলেন। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন এমন যন্ত্র উদ্ভাবন করতে যা দিয়ে অস্পষ্ট আলোতে সুস্পষ্ট ছবি তোলা যাবে। শীঘ্রই তিনি তাঁর বিস্ময়কর উদ্ভাবনের কথা ঘোষণা করলেন—তাঁর 'ইমেজ অর্থিকন' (image orthicon) এত আলোক-সুবেদী হল যে দেশলাইয়ের কাঠির আলোতেও অতি সুস্পষ্ট চিত্র গ্রহণ সম্ভব হতে লাগল। স্টুডিও কর্মীদের কাছে 'ইমেজ অর্থিকন' আশীর্বাদ-স্বরূপ হল, এবার তারা স্বস্তিতে কাজ করতে লাগল। বাইরেও আর উজ্জ্বল সূর্যালোকের প্রয়োজন রইল না। টেলিভিশনের ভ্রাম্যমাণ কর্মীরা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলেও বেস্‌ বল, ফুটবল ও রাজনৈতিক ঘটনার চিত্র নিতে লাগল। যেখানে সেখানে যখন তখন সংবাদচিত্র গ্রহণ করতে লাগল তারা, যদিও সে সময়ে আমেরিকায় গ্রাহক সেট ছিল সংখ্যায় নগণ্য।

কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে একটি পুরানো প্রবচন আছে 'ভাল মালই সে মালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন।' টেলিভিশনের বিস্ময়ের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লক্ষ লক্ষ লোক এ জিনিস দেখতে চাইতো, কিন্তু সুযোগ ছিল খুব অল্প লোকেরই।

কিন্তু টেলিভিশন সুপরিণত হওয়ার আগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশ্বকে গ্রাস করে ফেললো ; টেলিভিশনের উন্নতিও ব্যাহত হল। যে হাজার হাজার তরুণ কারিগর এই নতুন শিল্পের নানা জটিল বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিল তারা সকলেই চলে গেল যুদ্ধে।

ব্যবসার দিক থেকেও টেলিভিশন মার খেয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল তখন সে। নিউ ইয়র্ক শহরে ও তার চারিপাশের সব লোককে বিমান-হামলা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল এর সাহায্যে।

আহত সৈন্যদের হাসপাতালে টেলিভিশনের সাহায্যে খেলাধূলা ও ঘটনার চিত্র দেখানো হ'ত সে সময়।

উৎপাদন নেই, বিক্রী নেই—তবু বিজ্ঞানীরা ও কারিগরেরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়নি, তারা চেষ্টা করতে লাগল এর উন্নতির জন্য। যুদ্ধ শেষ হলে এক সময়ে এর বিরাট চাহিদা হবে এ বিশ্বাস সবারই ছিল।

যুদ্ধের সময়ে ইলেক্‌ট্রনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব উদ্ভাবন হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল রাডার, লোরান ও শোরান। লেবরেটরীতে অনেক যন্ত্র ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল যার গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এর মধ্যে ইনফ্রারেড যোগাযোগ ও বায়ুবাহিত টেলিভিশন উল্লেখযোগ্য। এই বায়ুবাহিত টেলিভিশন ক্যামেরা সেটের সাহায্যে সামরিক হেড কোয়ার্টারস বাস্তবিকই বহু মাইল দূরে শত্রুর গতিবিধি দেখতে পেতো। বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য বিচিত্র সব ইলেক্‌ট্রনিক টিউব উদ্ভাবিত হয়েছিল তখন।

এই শিল্পের প্রধান দান হল রাডার। আর্মি সিগন্যাল কোর-এর

সহায়তায় ১৯৩৪ সনেই এক 'সূক্ষ্ম-তরঙ্গ' (Micro-wave) যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। রাডারের চক্ষু থেকে যে সূক্ষ্ম-তরঙ্গ আলোকরশ্মি বিনির্গত হয় তা যার উপরে পড়ে তাকেই কুয়াশায়, অন্ধকারে বা দুর্ভেদ্য মেঘের মধ্যেও দৃশ্য করে তোলে। সঙ্কীর্ণ অর্থে একে বলা চলে অন্ধকার রাত্রিতে মানুষের হাতের ইলেকট্রিক টর্চলাইট। আলোকরশ্মি হয়তো দূরস্থিত কোন জানালায় পড়ে সেখানে প্রতিফলিত হয়ে এসে ঐ ব্যক্তির চোখে লাগে, ফলে জানালাটি দৃশ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য ঘন কুয়াশায় বা দুর্ভেদ্য মেঘের মধ্যে আলোক অল্পদূরে গিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইলেকট্রনিক আলোকরশ্মি আবহাওয়ার সব বাধা ভেদ করে নির্দিষ্ট বস্তুর উপর গিয়ে পড়ে এবং আবার প্রতিফলিত হয়ে এসে রাডারস্কোপে পড়ে কেবল লক্ষ্যবস্তুর অবস্থানই নয়, তার দূরত্বও নির্দেশ করে।

আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা—উভয়ক্ষেত্রেই রাডারের বিরাট গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবিভাগ অনুরোধ জানিয়েছিল যে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সমস্ত গবেষণা যেন একান্ত গোপনে চালানো হয়। সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী কর্তৃক রাডার সজ্জা ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত ৩,৭০০,০০০,০০০ ডলার।

দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের শেষ পর্যায়ে একটি বিশেষ কার্যকরী যন্ত্র-উদ্ভাবিত হয়েছিল, সে রাডারেরই নিকট জ্ঞাতি। এর নাম শোরান। শোরান প্রতিফলন বা প্রতিধ্বনি বাহিত প্রণালীতে পরিচালিত হ'ত এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা গেছে যে শোরানের কাজ নির্ভুলতার দিক থেকে সাধারণ বোমা ফেলার সমকক্ষ। শান্তির সময়ে শোরান পৃথিবীর ম্যাপ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল সার্ভে বিভাগে এ ব্যবহার করা হচ্ছে; ২৫০ মাইল দূরত্ব একেবারে সূক্ষ্মভাবে নির্ভুল করে মাপতে পারে সে। কিছুদিন আগে এক ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার কথাপ্রসঙ্গে বললেন: 'দূরত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইলেকট্রন আমাদের পরম বন্ধু বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

এক পুরুষ আগে যে কথা বললে উপহাসাস্পদ হতে হ'ত, আজ এর সহায়তায় তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এক অলৌকিকের যুগ শুরু হয়েছে এবার। আমাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকেই নয় শুধু, আমাদের স্বাস্থ্য এবং জীবনকেও প্রভাবিত করছে ইলেক্‌ট্রন।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'এই সব অলৌকিক ঘটনার হু'একটি উল্লেখ করুন তো?'

'এর একটি হল আলট্রাফ্যাক্স (Ultrafax) নামক একটি উন্নত ধরনের যোগাযোগ-ব্যবস্থা। এটি R. C. A. দ্বারা উদ্ভাবিত—টেলিভিশন রেডিও রিলে ও ফটোগ্রাফী প্রভৃতির মিলিত ব্যবস্থা এটা। আলট্রাফ্যাক্স প্রতি মিনিটে দশলক্ষ শব্দ হিসাবে বিরাট সংবাদ-প্রবাহ চালাতে সক্ষম। এই পদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, হলে এ একদিনে চল্লিশ টন বিমান ডাকের সমতুল বার্তা পাঠাতে পারবে। পরমাণু চূর্ণ করার ফলে শক্তির ক্ষেত্রে যেমন যুগান্তর এসেছে, দ্রুতগতি সংবাদ-প্রেরণক্ষেত্রে এও তেমনি যুগান্তর এনেছে।

'এ ছাড়া রয়েছে ইলেক্‌ট্রনিক গণক (Computer)—বিরাট সব রবট। এরা সহজে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারে, সেই ফলাফল আবার কাজে লাগাবার জন্য মুখস্থও রাখতে পারে। এই আধুনিক রবটগুলি ইনসিওরেন্স কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সাধারণভাবে সকল ব্যবসাক্ষেত্রই কারণিকী কার্য একান্ত সহজ করে দিচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে এতে কোটি কোটি ডলার বেঁচে যাবে। টাইফুন (Typhoon) নামে আরেক প্রকার গণকযন্ত্র নৌবিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং একমাত্র ক্ষেপণাস্ত্রের হিসাবের ব্যাপারেই তাতে সরকারের ২৫ কোটি ডলার বেঁচে যাচ্ছে।'

আমি জানতে চাইলাম, 'আমাদের শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছাড়া টেলিভিশন আর কি প্রকারে সাহায্য করতে পারে?'

এঞ্জিনিয়ারটি উত্তর দিলেন, 'অনেক রকমেই পারে। যে সব শিল্পে

কর্মীদের তীব্র তাপ, মারাত্মক গ্যাস অথবা পারমাণবিক বিকিরণের সম্মুখীন হতে হয় সেখানে ভিডিকন (Vidicon) নামক ছোট্ট আকৃতিবিশিষ্ট টেলিভিশন ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। ভিডিকন যন্ত্রটি পর্যবেক্ষক হিসেবে স্থাপন করা হয়। এ যা দেখতে পায় তার টেলিভিশন চিত্র সুপারিনটেণ্ডেন্ট বা ম্যানেজারের কক্ষে একটি মনিটর বা পর্দায় প্রতিফলিত করে। অনেক জেলখানায় এই ক্ষুদ্র ক্যামেরাটি পাহারা-ওয়ালার কাজ করে। কয়েদীর সেলের বাইরে থেকে এই ক্যামেরার সাহায্যে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দী রাখা হয়। দেখা গেছে অনেকক্ষেত্রেই সে পাহারাওয়ালার চেয়ে বেশী তৎপর।

'অনেক ব্যাঙ্কে দেখা গেছে চাপরাশ পরা প্রহরীর চেয়ে এই ক্যামেরা বেশী কার্যকরী ; কারণ কেবল গ্রাহকগণ নয়, কর্মচারীগণও এর পর্যবেক্ষণের অধীন। বিভাগীয় বিপণীতে ভিডিকন যে কাজে লাগছে তাতে তারা এর মূল্য দিয়ে সারতে পারবে না। বিভিন্ন বিভাগের মনিটরে বা পর্দায় বিশেষ বিশেষ জিনিসের বিজ্ঞাপন প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে এক বিভাগের ক্রেতা পর্দায় প্রতিফলিত কোন আকর্ষণীয় বস্তু দেখে অন্য বিভাগে গিয়ে সেটা কিনে নিচ্ছে।'

'আপনি আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবনের কথা উল্লেখ করেছিলেন, একটু ব্যাখ্যা করবেন কি ?'—আমি বললাম।

তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'কয়েক পুরুষ ধরে, যে সব সূক্ষ্ম জীবাণু আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবন বিপন্ন করে, তাদের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণের উপর নির্ভর করে আছে। জীবাণু শিকারীদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া, ব্যাসিলি ও ভাইরাস তাদের জ্ঞানের অগোচরেই রয়ে গেছে। এই লুকোচুরি খেলায় দেখা গেছে বিজ্ঞানীরা যেন সব চোখবাঁধা ; কারণ জীবাণুদের বর্ধিত করে দৃশ্য করে তুলবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই জীবাণুকে কয়েকশ গুণের বেশী বাড়িয়ে তোলা যায়নি।

'তারপরে এলো বিরাটাকার ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ ; এর

আকার এতই বড় যে প্রচলিত সাধারণ অণুবীক্ষণের সঙ্গে তুলনায় এ বস্তু, ক্যাপ পিস্তলের সঙ্গে তুলনায় কামানের মতো। এর সুতীব্র আলোক ভাইরাস এবং ব্যাক্টিরিয়ার অভ্যন্তর গঠন ফটোগ্রাফ করবার পক্ষে একান্ত উপযোগী ; কারণ এ বস্তুকে ৩৫০,০০০ গুণে বর্ধিত করে তোলে। একে বলা হয়েছে এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রায় পাঁচ শ'র বেশী এই অণুবীক্ষণ হাসপাতালে, কলেজে, সরকারী ব্যুরোতে ও গবেষণাগারে ব্যবহৃত হচ্ছে।'

কৌতূহল হল ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র কী করে জীবনরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তা জানবার। আমি এঞ্জিনিয়ারকে এর একটি উদাহরণ দিতে বললাম।

একটু হেসে তিনি বললেন, 'অনেকেই একথা শুনে অবাক হয়ে যাবে যে আজ আমাদের বিয়াল্লিশটি রাজ্যে ও কানাডাতে পুলিসেরা রাস্তার স্পীডোমিটার ব্যবহার করছে। উদ্দেশ্য ? মোটরগাড়ীর স্পীডের ফলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার কমানোই এর উদ্দেশ্য।

'গাড়ীর চালক বেআইনী স্পীডে গাড়ী চালাতে চালাতে পিছনের দৃশ্যের প্রতিফলন আয়নায় কোনো পুলিসের গাড়ী দেখতে পায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার স্পীড ঠিক মাপা হয়ে যায়। এক মাইল বা দু'মইল এগিয়ে সে দেখে পুলিসের পেট্রল গাড়ী তার জন্য অপেক্ষা করে আছে ; তাদের কাছে আছে তার গাড়ীর গতির হিসাব।

'এই অদৃশ্য ট্রাফিক পুলিস হল একটি এলুমিনিয়ম বাক্সের মতো ব্যাপার। এর ওজন প্রায় চল্লিশ পাউণ্ড। এতে দুটি পৃথক এণ্টেনা (Antenna) লাগানো আছে। পুলিসের গাড়ীর মধ্যে একে সযত্নে বসিয়ে রাখা হয়।

'যখন কোন গাড়ী বেআইনী গতিতে এগুতে থাকে, তখন একটি এণ্টেনা থেকে রাডার স্পীডোমীটার উচ্চ পৌনঃপুন্যসম্পন্ন রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ করে। এই সঙ্কেত দ্রুতগতি গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে পৌনঃপুন্য

পরিবর্তন করে আবার ফিরে আসে এবং পুলিসের গাড়ীতে দ্বিতীয় গ্রাহক এণ্টেনাতে গৃহীত হয়। পৌনঃপুন্যের পার্থক্য থেকেই দোষী গাড়ীর বেআইনী স্পীড মাপা হয়।

'সঙ্গে সঙ্গে একটি রেকর্ডে লাল কালিতে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যেকার স্পীড লেখা হয়ে যায়। প্রহরী গাড়ীর অফিসার অগ্রবর্তী পেট্রল স্টেশনে গাড়ীর নম্বর ও বর্ণনা এবং স্পীডের পরিমাণ রেডিওফোন করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়, বা তাকে শমন দেওয়া হয়। বেআইনী চালক হতভম্ব হয়ে পড়ে কী করে তার গাড়ীর স্পীড জেনে ফেললো পুলিস, এই ভেবে; কারণ তার কাছাকাছি কোথাও পুলিসের গাড়ী ছিল না।

'যে সব রাজ্যে রাডার স্পীডোমিটার ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে এ যে সুফলপ্রদ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জজ ও জুরীগণ এর সাক্ষ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বণিক-সভা ও মোটরমালিক সমিতি রাডার স্পীডোমিটারের নির্ভুলতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেক ব্যবসায়ী বলেন মোটর চালকেরা রাডার সংরক্ষিত এলাকা এড়িয়ে চলায় তাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু সর্বত্রই পুলিসগণ এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে একমত। ইণ্ডিয়ানায় গ্যারীতে রাডার পদ্ধতি প্রথম বৎসরেই ট্রাফিক মৃত্যু অর্ধেক করে দিয়েছে। মিসিসিপি রাজ্যের জননিরাপত্তার কমিশনার ঘোষণা করেছেন, 'রাডার ট্রাফিক মৃত্যু একেবারে কমিয়ে দিয়েছে। ক্লার্ক-স্ভিল ও টেনেসির সীমার মধ্যবর্তী পথে রাডার ব্যবহারের ফলে বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যা শতকরা সত্তর ভাগ কমে গেছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় আমি আমার সেই এঞ্জিনিয়ার বন্ধুর সঙ্গে একটি ছোট রেস্টুরেণ্টে ডিনার খেলাম। এখানে টেলিভিশন ও রেডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরাই সাধারণত খেতে আসে। কাছাকাছি টেবিলে বসেছে সব বড় বড় অভিনেতা, ডিরেক্টর, গায়ক ও কমেডিয়ান। ক্যামেরাম্যান, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, রেডিও ও টেলিভিশনের হোমরা-

চোমরাদের সেক্রেটারী প্রভৃতিরাও ছিল। নানাধরনের চলতি বুলিও শোনা গেল—কণ্ট্রাক্ট, চাকরি, বড় বড় মাইনে প্রভৃতি।

কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে শৈশব থেকেই রেডিও প্রস্তুত ও ইলেক্‌ট্রনিক সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করার আগ্রহ ও আকাজ্ক্ষা পোষণ করতেন আমার এঞ্জিনিয়ার বন্ধুটি। চোদ্দ বছর বয়সের সময়েই তিনি কয়েকটি স্ফটিক রেডিও সেট প্রস্তুত ও বিক্রী করেছিলেন। সেই উপার্জিত টাকায় বাড়ীর নিচেই তিনি একটি রেডিও মেরামতের হাসপাতাল খুললেন। কিছুদিনের মধ্যেই বেশ খদ্দের জুটে গেল তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে।

হাইস্কুলে পড়বার সময়ও তিনি স্থানীয় রেডিও মেরামতের দোকানে রাত্রিতে কাজ করতেন; সেখানেও তিনি মেরামতীর কাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কলেজ থেকে এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তিনি চাকরির খোঁজে বেরুলেন।

সে সময়ে চাকরির বেশ অভাব চলছে। নিতান্ত খেয়ালবশেই তিনি স্থানীয় টেলিফোন কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি একজন এঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আপনি যে কোন ধরনের কাজ দেবেন আমি তাই নিতে চাই।' তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'মনে হচ্ছে, তুমি পারবে। আচ্ছা, সকালবেলা এসো।'

কোম্পানির মেরামতী ও রক্ষণ বাহিনীতে নিযুক্ত হয়ে সত্বরই বুঝতে পারলেন তিনি যে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। এক ঝড়ে সে সময়ে তার ছিঁড়ে জড়িয়ে ও থাম ভেঙ্গে একাকার কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাজের সঙ্গে টেলিফোনী কারিগরির কোন সম্পর্ক ছিল না। কুড়ুল দিয়ে, করাত দিয়ে গাছ কাটা, টেনে তোলা, থাম বসানো—এই সব হল কাজ। বাইরে কয়েক মাস কাজের পরে তিনি আপিসের কাজে বদলী হলেন। একটি নতুন সুইচবোর্ডে তাকে অদক্ষ সহায়কের কাজ দেওয়া হল।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পারলো যে তিনি ঝালাই কাজে দক্ষ এবং সার্কিট সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষতম বলে স্বীকৃত হলেন। পুস্তক ও পুস্তিকা যোগাড়ের বাতিক ছিল তাঁর। 'বেল টেলিফোন লেবরেটরীতে তোমার জীবিকার সম্ভাবনা' নামীয় একখানা চটি বই পেলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের নিকট থেকে। এর ভূমিকা—'তরুণ বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ারদের প্রতি' একটি বাণী ছিল প্রেসিডেণ্টের লেখা।

সূচীপত্র পড়তে পড়তে তিনি বেল লেবরেটরী কেবল টেলিফোনীর ক্ষেত্রে নয়, সাধারণভাবে বিজ্ঞানের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে মানবমঙ্গল ও দেশের সামরিকবাহিনীর জন্য যে যে কাজ করেছে সে সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করলেন; নিজের ভবিষ্যৎও যেন তিনি সুনির্দিষ্ট দেখতে পেলেন।

বইখানার সঙ্গে ছিল একখানা দরখাস্তের ফরম এবং যোগ্যতা ও গুণাবলীর রেকর্ড। দরখাস্তকারীকে তার শিক্ষা, কলেজের কার্যাবলী, কলেজের বাইরের কার্যাবলী, চাকরি ও ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও সামরিক চাকরি প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। বেশ যত্নসহকারে ও পরিচ্ছন্নভাবে ফরম পূরণ করে তিনি এমপ্লয়মেণ্ট ডিরেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন দরখাস্ত। তারপর দরখাস্তের জবাবের জন্য উদ্বিগ্নভাবে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। একদিন বিকেলে তিনি ডিরেক্টরের নিকট থেকে এক চিঠি পেলেন। তাতে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের জন্য নিউ ইয়র্কে যেতে বলা হয়েছে তাঁকে।

এর এক সপ্তাহ পরে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হলেন। নিয়মিত কাজ ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শীঘ্রই তাঁর উন্নতির পথ খুলে দিল। দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর নাম দুটি উল্লেখযোগ্য ইলেক্ট্রনিক উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত হল। ট্র্যানসিস্টারের প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর গবেষণা তাঁর খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দিল এবং তাঁর নাম কৃতী পুরুষদের সঙ্গে উল্লিখিত হতে লাগল।

তাঁর কাহিনী সম্বন্ধে নোট নেওয়া শেষ হলে আমি সাহস করে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। 'জীবিকার দিক থেকে এই বিস্তৃত যোগা-যোগক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনার মতামত কী ?'

'যে সব তরুণ তরুণীরা স্থায়ী চাকরি চায় এবং দায়িত্ব ও বেতনের দিক থেকে সুব্যবস্থা ও নিয়মিত উন্নতি কামনা করে—তাদের আমি এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পরামর্শ দিই। এটি একটি স্থায়ী-শিল্প, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহের মতই প্রয়োজনীয় এ। আমাদের বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থ ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলে সামরিক যন্ত্রও ব্যর্থ হবে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে এই যোগাযোগ তন্ত্রের তুলনা করা চলে। একটি বিকল হলে সবগুলিই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।'

প্রশ্ন করলাম, 'যোগাযোগ শিল্পে চাকরির সংখ্যা সম্বন্ধে একটি ধারণা দিতে পারেন কি আমাকে ?'

তিনি বললেন, 'সেটা অসম্ভব। কিন্তু আমি আপনাকে অন্য দিক থেকে ধারণা দিতে চেষ্টা করছি। আমেরিকান টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানির কর্মী-সংখ্যা আট লক্ষ। R. C. A-র বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু এরা ছোট বড় পাঁচ হাজার উৎপাদকের কাছ থেকে মালপত্র কেনে। তারা আবার লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত করে। তাছাড়া ভুলে যাবেন না যে প্রায় পাঁচ হাজার স্বাধীন টেলিফোন কোম্পানি আছে, তারাও বেশ বড় সংখ্যায় কর্মচারী নিযুক্ত করে। আমাদের সমরবিভাগই শুধু সামরিক যোগাযোগে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা সঠিকভাবে জানে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিযুক্ত অসংখ্য অজ্ঞাত অপারেটার ও কারিগর রয়েছে। কাজেই বুঝতে পারছেন যোগাযোগ ক্ষেত্রে কী বিরাট সংখ্যক মানুষ তাদের খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান করছে।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আরেকটি প্রশ্ন। যাদের বিজ্ঞানের

দিকে ও আবিষ্কার প্রবণতা আছে যোগাযোগক্ষেত্রে তাদের বর্তমানে কী সুযোগ আছে?'

'এই শিল্পের ইতিহাসে যে কোন সময়ের চেয়ে সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। অধিকাংশ বড় বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবনই এক্ষেত্রেও বিবর্তন সূত্রেই ঘটেছে। যদি বৈদ্যুতিক বিষয় সম্বন্ধে গ্যালভানি, ভল্টা এবং ফ্যারাডে গবেষণা ও আবিষ্কার না করতেন, তবে স্যামুয়েল মর্স হয়তো রঙ তুলি ফেলে রেখে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন না। আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল মর্সের টেলিগ্রাফকে আরও কার্যকরী করবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ঐকতানিক টেলিগ্রাফের কাজ করতে হঠাৎই তিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ইলেক্‌ট্রনিক তরঙ্গ সম্বন্ধে হেনরিখ হার্‌ৎসের আবিষ্কার মার্কনিকে বেতারে বার্তা প্রেরণে উৎসাহিত করে। তারপরে এলেন ফ্লেমিং তাঁর ভালব নিয়ে, ফলে বেতার কণ্ঠধ্বনি অস্পষ্টভাবে হলেও বহন করতে লাগল। ডি ফরেস্টের বায়ুহীন নল রেডিওর আরও উন্নতি ঘটালো। প্রেরিত শব্দকে বহুগুণে বর্ধিত করে এ তা পরিষ্কারভাবে শ্রুতিগম্য করে তুললো।

'১৮৭৫ সনেই কেরী (Carey) নামে একজন বিজ্ঞানী বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন সাইলেনিয়াম সেল দ্বারা গঠিত পর্দা ব্যবহার করে টেলিভিশন তৈরির প্রথম চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে টেলিভিশনের জন্য কোন চিত্র বা বিষয়কে অসংখ্য অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশকে পৃথকভাবে প্রেরণ করা প্রয়োজন, যাতে গ্রাহকযন্ত্রে সেগুলিকে আবার জুড়ে নেওয়া যায়।

'বহু বছর পরে ভ্লাডিমির জ্বোরোকিন একরকম বৈদ্যুতিক চক্ষু উদ্ভাবন করেন, তিনি তার নাম দেন আইকোনোস্কোপ। কেরী বৈদ্যুতিক উপায়ে যা করতে চেয়েছিলেন, জ্বোরোকিন ইলেক্‌ট্রনিক উপায়ে তা করলেন। তারপর যথাসময়ে ঐ মস্তিষ্কেই জেগে উঠলো

'ইমেজ অর্থিকন'। এই অর্থিকনই বর্তমান কালের টেলিভিশনের মূল বিষয়।

'কাজেই মানুষ ও ভাবের পৌর্বাপর্য এখনও অব্যাহত চলেছে। পূর্ববর্তী পুরুষের নিকট থেকে পরবর্তী পুরুষের বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, এঞ্জিনিয়ার ও কারিগরেরা পায় তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও তথ্যের বিরাট সম্পদ। এই সম্পদের প্রাণরসে পরবর্তী যুগ পুষ্ট হয়, এরই ভিত্তিতে তাদের সব কিছু গড়ে তোলে তারা।'

বিদায় নেবার সময় এঞ্জিনিয়ার বন্ধু বললেন, 'ভুলে যাবেন না; দূরত্ব জয়ের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আজও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত রয়েছে কেউ জানে না; কিন্তু প্রতিদিনের অগ্রগতি উন্নততর ভবিষ্যতেরই সূচনা করে।'

Men Against Distance by John Floherty.